হাত বাড়ালেই

বর্ষ ৪ সংখ্যা ৩

সুবিধা

Suvida

ফেসবুকে suvidapatrika আর
টুইটারে লগ অন করুন suvidamagazine লিখে

দাম মাত্র দশ টাকা

আই ভি এফ

নলজাতকের ইতিকথা

- ছোট মাছের পাঁচ-সাত
- মেগা ধারাবাহিকে মেয়েদের অবস্থান
- কাশ্মীরে কয়েকদিন
- মাথাব্যথার নানা দিক
- সন্তান যখন মিথ্যে বলে, চুরি করে
- পুজোর জন্য কিছু পোশাকি টিপস
- নারীর সুরক্ষায়

দুঃশ্চিন্তা কেন হবে অন্তরায়?

উত্তর আছে শেষ মলাটের ভিতরের পাতায়

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
কাকলি চক্রবর্তী
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

Printed & Published by
Sunil Kumar Agarwal
Printed at
Satyajug Employees' Cooperative Industrial Society Ltd.
13,13/1A, Prafulla Sarkar Street,
Kolkata-700 072
RNI NO : WBBEN/2011/39356

চিঠি পত্তর ৪
শব্দজব্দ ৪
সম্পাদকীয় ৫
প্রচ্ছদকাহিনি ৬
হেঁশেল ১৬
বিনোদন ১৮
ডাক্তারের চেম্বার থেকে ২০
পোশাকি বাহার ২২
কথা কাহিনি ২৪
আইনি ২৭
তুমি মা ৩০
কাছে দূরে ৩২
বিশেষ রচনা ৩৬
কৌতুক ৪০
কবিতা ৪১
ভূত ভবিষ্যৎ ৪২

প্রচ্ছদ কাহিনি

৬ আই ভি এফ : নলজাতকের ইতিকথা

৩২ কাছে দূরে
কাশ্মীরে কয়েকদিন

২০ ডাক্তারের চেম্বার থেকে
মাথা নিয়ে মাথাব্যথা

হেঁশেল ১৬
ছোট মাছের পাঁচ-সাত

তুমি মা
৩০
শিশুর ব্যবহারিক সমস্যা হলে

পোশাকি বাহার
২২
পুজোর জন্য কিছু টিপস

চিঠিপত্র

ভাগ্য গণনা ও ভূত

সুবিধার জুন মাসের সংখ্যায় ভাগ্য গণনা বা জ্যোতিষ বিদ্যা নিয়ে যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। আমরা জ্যোতিষ বা ভাগ্য গণনা যে সবাই বিশ্বাস করি তা নয়, তবুও কেন জানি না ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার বা ভাগ্য গণনা পদ্ধতি নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই। অনেকটা ভূতের গল্প শোনার মতো। ভূতে বিশ্বাস করি না বললেও, কোথাও যেন অন্ধকার রাতে ভূতুড়ে পরিবেশে বসে ভূতের গল্প শুনলে গা ছম ছম করে, কোনও একটা অকারণ অনুভূতি সারা শরীরে শিরশির করে। সে যাই হোক ভাগ্য গণনা নিয়ে লেখা পড়ে বেশ মজাই পেয়েছি।

পৃথা ঘোষ, যোধপুর পার্ক

নিউমেরলজি নিয়ে লেখা চাই

ভবিষ্যদ্বানী বা ভাগ্য গণনা নিয়ে সুবিধার প্রচ্ছদকাহিনি পড়লাম। আপনারা অনেক কিছুই ছুঁয়ে গেছেন অথচ খুব গভীরে যাননি। এতে আমাদের পুরো খিদে মেটেনি। বিশেষত নিউমেরলজি নিয়ে যদি আরও বড় করে বিশদে একটি লেখা উপহার দেন তাহলে খুশি হব।

অশোক সেনগুপ্ত, সোনারপুর

সিনেম্যাটিক গল্প

'সুবিধা' পত্রিকা অনেক দিন ধরেই দেখছি। আপনাদের পত্রিকার গল্প আমার খুব পছন্দের। তবে জুন সংখ্যায় বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিকিতাকা' গল্পটি আমার খুব ভাল লেগেছে। সুবিধার সম্পাদক সুদেষ্ণা রায় তো সিনেমা পরিচালনা করেন, উনি এই গল্পটা নিয়ে ভাবতে পারেন। এর সিনেম্যাটিক দিকটা বেশ আকর্ষক হবে বলে আমার ধারণা।

শ্রীময়ী সেনগুপ্ত, হাওড়া

আরও গল্প চাই

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'তিকিতাকা' পড়ে খুব ভাল লেগেছে। একটা সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্যে কেমন নষ্ট হয়ে গেলেও, তার রেশটা কিন্তু থেকে যায়। সেই রেশটা খুব সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই গল্পে। সুবিধাকে অনুরোধ এরকম আরও গল্প দিন আমাদের

রঞ্জন মান্না, তমলুক

মনে ধরেছে

অগ্নিমিত্রা পাল এর নাম কাগজে বহুবার দেখেছি। ওঁর তৈরি পোশাক নিয়ে আলোচনাও হয়েছে পড়েছি। সুবিধার প্রকাশিত শাড়িগুলো আমার মনে ধরেছে। ধন্যবাদ সুবিধা।

রিতা দে, শ্যামবাজার

শাড়ি নিয়ে প্রতিবেদন

আজকাল শাড়ি নিয়ে কতরকম নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, শাড়ি পরার ধরণ, শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজের ছাটের পরিবর্তন, শাড়ির নকশা, শাড়ির সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিকের ব্যবহার এসব নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করলে খুশি হব।

দোলা শিকদার, বেহালা

আপনারা অবশ্যই লেখা পাঠাতে পারেন। গল্প, কবিতা, আপনাদের তোলা ছবি, আপনাদের স্থানীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা, ভ্রমণ কাহিনি। মনোনীত হলে সুবিধা-য় ছাপা হবে। তবে যা পাঠাবেন কপি রেখে পাঠাবেন। —সম্পাদক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে শব্দজব্দ ২৪ শ্যামাদুলাল কুণ্ডু

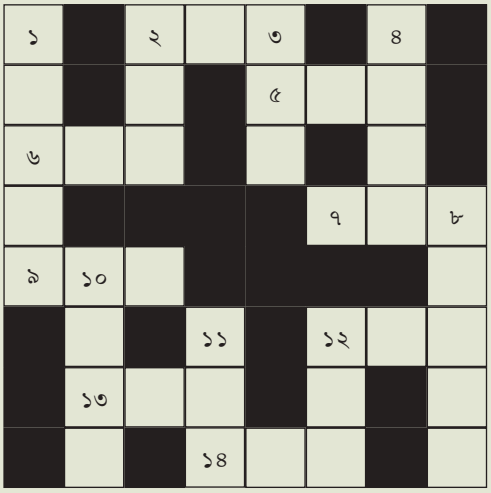

২। 'জগত্তারিনী' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত 'আলো ও ছায়া'-র মহিলা কবি এবং 'বেথুন'—এর অধ্যাপিকা। ৫। রৈবত রাজার পরমাসুন্দরী কন্যা ও বলরামের অন্যতমা পত্নী। ৬। বিখ্যাত বাউল সাধক গীতিকার ও গায়ক এই ফকির। ৭। মল সাফ করা এই নিম্নসম্প্রদায়ের হরিজন নাম দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধিজী ৯। রবীন্দ্রনাথের পরেই সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক। ১২। 'নিও রিয়েলইজম'-এর অন্যতম স্রষ্টা এই জনপ্রিয় ভট্টাচার্য শিল্পী। ১৩। বলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক-নায়ক এই খান্না। ১৪। এঁরই পুত্র হনুমান।

উপরনিচ

১। 'ভাষা আন্দোলন' থেকে যে দেশের সৃষ্টি। ২। এক সময়ের শ্রেষ্ঠ গায়িকা-নায়িকা, রবীন্দ্রভারতী-র প্রাপ্ত সাধারণে দেবী হিসাবে পরিচিতা। ৩। 'উলঙ্গরাজা'-র কবি এই চক্রবর্তী। ৪। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা 'জাগরী' উপন্যাসের স্রষ্টা ভাদুড়ি। ৮। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দ্বিতীয় বাঙালি আই সি এস এই দত্ত, রামবাগানের দত্ত পরিবারের বংশধর। ১০। নাট্যকার-অভিনেতা অমৃতলাল বসু সর্বসাধারণের কাছে যে নামে পরিচিত। ১১। খ্রিষ্টীয় চার্চের যাজক। ১২। 'পশ্চিমবঙ্গের রূপকার' দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রায়।

সমাধান শব্দজব্দ ২৪

বা	■	কা	মি	নী	■	স	■
ং	■	ন	■	রে	ব	তী	■
লা	ল	ন	■	ন্দ্র	■	না	■
দে	■	■	■	■	মে	থ	র
শ	র	ৎ	■	■	■	■	মে
■	স	■	বি	■	বি	কা	শ
■	রা	জে	শ	■	ধা	■	চ
■	জা	■	প	ব	ন	■	ন্দ্র

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম আমার সিনেমার স্ক্রিনিং উপলক্ষ্যে। প্রতিবছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও না কোনও শহরে নর্থ অ্যামেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিরা তিনদিন ব্যাপী এই উৎসব উদ্‌যাপন করেন তাঁদের বাঙালিয়ানা জাহির করতে। প্রবাসে বসবাস করলেও তাঁরা তাঁদের বাঙালি মনন, বাঙালি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, পোশাক, ভাললাগা, ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরে রাখেন। তাঁদের বাঙালি সত্ত্বা বার্গার, কেএফসি, মার্সেডিজ বা ল্যাম্বোরগিনির চাপে যে হারিয়ে যায়নি, তাই প্রমাণিত হয় প্রতি বছর এই তিনদিন ব্যাপী উৎসবে। এবছর এনএবিসি অনুষ্ঠিত হয় ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো শহরে। সেখানে অঞ্জন ঘোষাল-এর নেতৃত্বে আয়োজিত বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম আমি। সঙ্গে ছিলেন সস্ত্রীক সন্দীপ রায়, তাঁর ছবি 'চার' সমেত। এছাড়া ছিল আবীর, অরিন্দম শীল ও শাশ্বত। দুই নায়িকা পায়েল সরকার ও অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ও সঙ্গে ছিল। আমাদের অর্থাৎ অভিজিৎ গুহ ও আমার ছবি 'যদি লাভ দিলে না প্রাণে' এবং পুরনো ছবি 'ক্রস কানেকশন' দেখানো হয় এই উৎসবে। অরিন্দমের 'আবর্ত', অঞ্জন দত্তর 'শেষ বলে কিছু নেই', এবং আবীব, জিৎ অভিনীত 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-ও দেখানো হয় তিনদিনের উৎসবে। সঙ্গে ছিল সিনেমা কুইজ ও আলোচনা। এই উৎসবে ছবি দেখতে আসা বহু অ্যামেরিকা প্রবাসী বাঙালিই বাংলা তথা ভারতের বহু মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দেখে অবাক হন, কখনও বা নিরাশ হন, কখনও বা উৎফুল্ল। এই আদান-প্রদান দুপক্ষের জন্যই হয় নানা বিষয়ে চক্ষু উন্মোচনে অভিজ্ঞতা

বহু বছর ধরে নলজাতক বা টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে অনেক তথ্য, অনেক ঘটনা, অনেক লেখা পড়েছি। কিন্তু সম্প্রতি মাথায় সিঙ্গল মাদার নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে জেগে ওঠে। এখন বেশ কিছু মহিলা টেস্ট টিউব পদ্ধতি অবলম্বন করে একাই মা হচ্ছেন, অথবা বহু সেলিব্রিটি দম্পতি সারোগেট মাদার-এর মাধ্যমে বাবা-মা হয়ে উঠছেন। এই রহস্যের বা জন্মপদ্ধতির নানা দিক, নানাভাবে আমাকে আকৃষ্ট করে। এ সম্পর্কে পাঠকেরও নানা কৌতুহল থাকে। নলজাতক পদ্ধতির মাধ্যম আবার বহু নিঃসন্তান দম্পতির জীবনে আশা ও আনন্দের আলো ফুটে উঠেছে। তাই এবারের প্রচ্ছদকাহিনি সেই জন্মরহস্য ভিত্তিক।

বাংলা ধারাবাহিক অর্থাৎ টেলিভিশন ধারাবাহিকের রমরমা অনস্বীকার্য। এই ধারাবাহিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলা ভিত্তিক কাহিনিই প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা পায়। আমাদের ফিল্ম বা সিনেমার জগতে, বিশেষত বাণিজ্যিক সিনেমার ক্ষেত্রে কাহিনি পুরুষ ভিত্তিক। মহিলাদের অবস্থান সেখানে কিছুটা নেপথ্যচারিনীর মতো। কিন্তু টেলিভিশনে নারী চরিত্র-র অগ্রণী ভূমিকাই সাফল্যের চাবিকাঠি। তবে এখন সিনেমায়ও নারী চরিত্র ভিত্তিক ছবি হচ্ছে, যা জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এবারে বিনোদন ও বিশেষ রচনায় সিনেমা-টিভিতে নারী নিয়ে হয়েছে পর্যালোচনা।

সামনেই পুজো আসছে। পুজোর বাজারের সময় হয়ে এল। এই দু'মাস চলবে পুজোর বাজার। তাই এবারের 'ফ্যাশন' বিভাগে থাকছে, পুজোর জন্য কেনাকাটার কিছু টিপস। সবশেষে অগাস্ট মাসে আমাদের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জানাই বন্দে মাতরম।

সুদেষ্ণা রায়

সুবিধার গ্রাহক হতে চান

আপনারা যদি নিয়মিত গ্রাহক হতে চান তাহলে নিচের কুপনটা ভরে সঙ্গে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন হিসাবে, মোট পঞ্চাশ টাকার একটি 'A/C Payee' চেক সহ আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন। চেক হবে Eskag Pharma Pvt Ltd এই নামে।

৬টি সংখ্যা মাত্র ৫০ টাকায়। এই দুর্মূল্যের বাজারে করুন সাশ্রয়

নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

কী করেন .....দূরভাষ.....

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagsuvida@gmail.com

পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বিনামূল্যে ডাকযোগে পৌঁছে দেওয়া হবে

আই ভি এফ : নলজাতকের ইতিকথা

সন্তানহীন দম্পতির মুখে হাসি ফোটানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রধান সহায় ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা আই ভি এফ। আই ভি এফ বা টেস্ট টিউব বেবি বা নলজাতক শব্দগুলো আজকের দিনে যথেষ্ট পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে বহু মানুষেরই ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। তার ওপর আছে একে ঘিরে নানা কুসংস্কার। আই ভি এফ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট গায়নোকোলজিকাল ল্যাপারোস্কোপিক সার্জেন **ডাঃ গৌতম খাস্তগীর**

পথ দেখালেন যাঁরা

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক স্টেপটো এবং ডঃ রবার্ট এডওয়ার্ডস-এর প্রচেষ্টায় পৃথিবীর প্রথম টেস্ট টিউব বেবি বা নলজাতকের জন্ম হয়। সেই শিশুর নাম লুইস ব্রাউন। সেটা ছিল ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই। এর ঠিক আড়াই মাস বাদে জন্ম নেয় দ্বিতীয় নলজাতক শিশু দুর্গা। আর কলকাতার বুকে এই টেস্টটিউব বেবির জন্মগ্রহণ করায় যাঁর অবদান সারাদেশের লোককে মনে রাখতে হবে, তিনি হলেন ডঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। রবার্ট এডওয়ার্ড-এর পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি ফ্রোজেন এমব্রায়ো ট্রান্সফার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। সেই পদ্ধতিই বিশ্বজুড়ে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা আজ ব্যবহার করছেন আই ভি এফ-এর জন্য। যদিও দুঃখের বিষয় হল, এত বড় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েও তাঁকে সহ্য করতে হয় নানারকম অবমাননা, উপেক্ষা। লাগাতার অপমান সহ্য করতে না পেরে একদিন আত্মহত্যা করেন তিনি। তাঁর অবদানের কথা যে কোনও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে বাধ্য।

মহান ভারতের মহা কাহিনিতে

ভারতের পৌরাণিক কাহিনিতে টেস্টটিউব বেবি-র উল্লেখ না থাকলেও যেভাবে কিছু সন্তান জন্মানোর কথা বলা হয়েছে তা এই পদ্ধতিরই ইঙ্গিত দেয়। যেমন গান্ধারী নির্দিষ্ট সময়ের পরেও সন্তান প্রসব করতে না পারায় রাগে নিজের পেটে আঘাত করে গর্ভপাত ঘটান। বেদব্যাসের পরামর্শে সেই মাংসপিন্ড শত টুকরো করে ঘি মাখিয়ে এক একটি টুকরো এক একটি কলসিতে রাখা হয়। ঠিক সময়ে তার মধ্যে শিশু পুত্র জন্মানোর ঘটনা কি টেস্ট টিউব বেবিরই ইঙ্গিত দেয় না!

দ্রোণাচার্যেরও জন্ম হয় কলসিতে। এসব থেকে বোঝা যায়, সে যুগেও এ ধরনের পদ্ধতির চিন্তাভাবনা ছিলই।

সহজ পথের সহজ পাঠ

অনেকেরই স্বাভাবিক নিষিক্তকরণ বা ফার্টিলাইজেশন কীভাবে হয় সে সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। আগে সে বিষয়টা জানা দরকার। মেয়েদের শরীরে জরায়ুর দু পাশে দুটো আয়তাকার, চ্যাপ্টা অঙ্গ রয়েছে। এদের বলে ওভারি বা ডিম্বাশয়। ডিম্বাশয়ের কর্টিক্যাল অংশে অসংখ্য থলির মধ্যে বাস করে ডিম্বাণু-রা। জন্মের সময় প্রত্যেকটা মেয়ের একেকটা ডিম্বাশয়ে প্রায় দশ লক্ষ ডিম্বাণু থাকে। নির্দিষ্ট বয়সের পর ডিম্বাশয় দুটোর যে কোনও একটার থেকে প্রতি মাসে একটা করে ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়ে ফ্যালোপিয়ান টিউবে আসে। শারীরিক সম্পর্কের পর ফ্যালোপিয়ান টিউবে থাকা ডিম্বাণুর সঙ্গে পুরুষের শুক্রাণু মিলিত হয়। মিলিত বা নিষিক্ত হওয়ার পর সৃষ্টি হয় ভ্রূণ। তারপর তা চলে যায় জরায়ুতে। এটাই সন্তান ধারণের সহজ এবং স্বাভাবিক পথ।

গর্ভধারণ না করার অর্থ এই স্বাভাবিক কাজটা না হওয়া। এই অবস্থা বেশিদিন ধরে চললে তাকে বন্ধ্যাত্ব বলা হয়। সাধারণত বিয়ের পর একবছর অসুরক্ষিত যৌন জীবন কাটিয়ে যদি কেউ সন্তান ধারণ না করে, তাহলে তাকে বন্ধ্যা বলা হয়। স্ত্রীর বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি হলে তখন আর ১ বছর নয়, ৬ মাস সময় ধরতে হবে। এটা ঠিক, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার হারও কমতে থাকে।

নারী-পুরুষ সমান সমান

বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় চিরদিন মেয়েদের দিকে আঙুল তোলা হলেও এই দায় নারী-পুরুষ উভয়েরই। শুক্রাণুর সমস্যা থাকলে মহিলা গর্ভধারণে অক্ষম হন তাই এক্ষেত্রে দায়টা পুরুষেরই। যে যে কারণে স্বাভাবিক ফার্টিলাইজেশন হয় না সেগুলো হল, পুরুষের শুক্রাণুর অনুপস্থিতি বা অস্বাভাবিকতা, মেয়েদের ডিম্বাশয়ের অনুপস্থিতি, ডিম্বাণু নিঃসরণ অস্বাভাবিক কিংবা না হওয়া, কোনও কারণে ডিম্বনালী বন্ধ থাকা বা না থাকা, একটোপিক প্রেগন্যান্সি, এন্ডো মেট্রিওসিস, জরায়ুর কোনও সমস্যা, অস্বাভাবিকতা, পলিপের উপস্থিতি, ফাইব্রয়েড টিউমার, যক্ষ্মা সংক্রমণ কিংবা কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই বন্ধ্যাত্ব। এসব ক্ষেত্রে আই ভি এফ-এর প্রয়োগে অনেক সময়ই ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডিম্বনালীতে প্রতিবন্ধকতা থাকলে ডিম্বাশয় থেকে নির্গত ডিম্বাণু সেখানে পৌঁছতে পারে না। এরকম ক্ষেত্রে আই ভি এফ ভাল কাজ দেয়। আবার এন্ডোমেট্রিওসিসেও ডিম্বাণু তৈরি হওয়া সত্ত্বেও সন্তান ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া পলিসিস্টিক ওভারি, পুরুষের শুক্রাণু কম থাকা, এসব সমস্যা থাকলেও আই ভি এফ-এর প্রয়োগে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

আই ভি এফ-এর ধাপ আছে। চাপ নেই

আই ভি এফ পদ্ধতিটি-র বিভিন্ন পর্যায় আছে। তার মধ্যে প্রথম ধাপ বলা যায় ফলিকিউলার স্টাডি। চিকিৎসা করাতে আসা মহিলার শরীরে ওষুধ দিয়ে কিছু ভাল মানের ডিম্বাণু তৈরি করা হয়। চিকিৎসক এমন ওষুধই দেন যাতে অনেক বেশি পরিমাণে ডিম্বাণু তৈরি হয়। লক্ষ রাখতে হয় ডিম্বাণুগুলোর ক্রমিক বৃদ্ধির দিকেও। কারণ ঠিক সময়ে ডিম্বাণুগুলোকে বের করে আনতে হবে। এই পদ্ধতিকেই বলে ফলিকিউলার স্টাডি। দু ধরনের ওষুধ এ সময়ে ব্যবহার করতে হয়। প্রথমে যে ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার নাম গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন বা জিএনআরএইচ। এর ফলে ডিম্বাণু নিজে থেকে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তার নাম গোনাডোট্রপিন। ওষুধটি ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন। এটি হিউম্যান মেনোপজাল গোনাডোট্রপিন নামেও পরিচিত। এর কাজ ডিম্বাণু তৈরি ও তা বড় হতে সাহায্য করা।

দ্বিতীয় ধাপে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে

ডিম্বাণুটি যে কুঠুরিতে বড় হচ্ছে সেটি ফেটে যাতে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য হিউম্যান কোরিওনিক গোনাড্রোট্রপিন নামে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার ৩২-৩৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্যে প্রসবদ্বার দিয়ে ডিম্বাণুগুলোকে বের করে গবেষণাগারে রেখে দেওয়া হয়।

তৃতীয়ধাপে, যে মহিলার ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হল তার স্বামীর স্পার্ম বা বীর্য সংগ্রহ করা হয়। এই কাজ যেদিন ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয় সেদিনই করণীয়। এক্ষেত্রেও বাছাই করা শুক্রাণুই সংগ্রহ করা হয়।

চতুর্থ ধাপে তৈরি করা হয় ভ্রূণ। গবেষণাগারে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু-র নিষেক ঘটানো হয়। ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয় ভ্রূণ।

পঞ্চম ধাপে সেই ভ্রূণ জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বোঝা যায় কোন ভ্রূণগুলোর কোষ বিভাজন শুরু হয়েছে। সেগুলোই জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। ভ্রূণ স্থানান্তরকরণের এই পদ্ধতিকে বলা হয় ভ্রূণ স্থাপন বা এমব্রায়ো ট্রান্সফার।

এই পদ্ধতিতে যেহেতু দেহের বাইরে জীবন সৃষ্টি করা হচ্ছে তাই একে বলা হয় ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। 'ভিট্রো' শব্দের অর্থ শরীরের বাইরে, তাই এমন নাম। প্রচলিতভাবে একেই টেস্টটিউব বেবি বলে।

ভ্রূণ জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের পরে এমন কিছু ওষুধ দেওয়া হয় যাতে জরায়ু ভ্রূণটি ধরে রাখতে পারে। মনে রাখতে হবে, অনেকক্ষেত্রে ভ্রূণ স্থাপন করার পর তা বিফল হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তখন আবারও চেষ্টা করতে হয়। একবারেই সব ঠিকঠাক হবে তা ধরে নেওয়া উচিত নয়। উল্টোদিক থেকে বললে একবার না হলে আশা ছেড়ে দেওয়াও অর্থহীন।

সপ্তপথে স্বপ্নপূরণ

স্বাভাবিক আই ভি এফের যে পদ্ধতির কথা বলা হল তা ছাড়াও ছয় রকম অর্থাৎ মোট সাত প্রকারের আইভিএফ প্রয়োগ হতে পারে।

ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইঞ্জেকশন বা আই সি এস আই

পুরুষদের সমস্যা দূর করে এই পদ্ধতিতে সন্তান উৎপাদন করা হয়। অনেক ছেলেরই শুক্রাণুর সংখ্যা এত কম হয় যে ওই সংখ্যার সাহায্যে স্বাভাবিক গর্ভসঞ্চার হওয়া অসম্ভব। এমনকী আইভিএফ পদ্ধতি প্রয়োগ করেও তেমন সাফল্য আসে না। এই পদ্ধতিতে একটি শুক্রাণুকে ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। মহিলার ডিম্বাণুগুলোকে ডিম্বাশয় থেকে বের করে আনার পরে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে দেখে নিয়ে একটি মাত্র শুক্রাণু ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ডিম্বাণুতে গেঁথে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির সবচেয়ে সুবিধা হল কোনও পুরুষের একটি মাত্র সক্ষম শুক্রাণু থাকলেও তার ব্যবহার করে গর্ভসঞ্চার সম্ভব।

পি ইএস এ বা পেসা

একে বলা হয় সার্জিক্যাল স্পার্ম রিট্রিভাল। অর্থাৎ অস্ত্রোপচারের সাহায্যে শুক্রাণু সংগ্রহ করা। কিছু পুরুষের পর্যাপ্ত শুক্রাণু থাকা সত্ত্বেও তা শরীর থেকে

অজ্ঞান করে সূচ ফুটিয়ে অণ্ডকোষ থেকে শুক্রাণু বের করে আনা হয়। এই পদ্ধতিটিকেই বলে পেসা। এরপর এই শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে টেস্ট টিউব বেবি তৈরি করা হয়।

নিঃসৃত হতে পারে না। এর জন্য দায়ী হতে পারে কোনও জন্মগত প্রতিবন্ধকতা, সংক্রমণ, হার্নিয়া বা হাইড্রোসিল জনিত সমস্যা ইত্যাদি। এই পদ্ধতি বেশ সহজ। যার এই সমস্যা আছে সেই ব্যক্তিকে অজ্ঞান করে সূচ ফুটিয়ে অন্ডকোষ থেকে শুক্রাণু বের করে আনা হয়। এই পদ্ধতিটিকেই বলে পেসা। এরপর এই শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে টেস্ট টিউব বেবি তৈরি করা হয়।

এমব্রায়ো হ্যাচিং

চারদিকে থাকা খোলা ভেঙে ভ্রূণ বাইরে যখন বেরিয়ে আসে তাকে বলে এমব্রায়ো হ্যাচিং। বেরিয়ে আসা ভ্রূণটি জরায়ুর মধ্যে স্থাপিত হয়ে বাড়তে থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অসুবিধা থাকে। তখন কৃত্রিমভাবে খোলা ভাঙতে হয়। তাহলেই আর গর্ভ ধারণে সমস্যা হয় না।

প্রি-ইমপ্লান্টেশন জেনেটিক ডায়াগনসিস

এই পদ্ধতিতে ভ্রূণ জরায়ুতে স্থাপনের আগে পরীক্ষা করে দেখা হয় তার মধ্যে বংশগত কিছু অসুখের আশঙ্কা আছে কী না। যদি কোনও আশঙ্কা থাকে তাহলে ভ্রূণটি স্থাপন করা হয় না।

ডিম্বাণু দান এবং ভ্রূণ দান

যে সমস্ত মহিলার শরীরে ডিম্বাণু তৈরি হয় না বিশেষ কোনও সমস্যার কারণে তাঁদের ক্ষেত্রে ডিম্বাণুদানের মাধ্যমে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করা হচ্ছে। এবং এর সাফল্যের হারও বেশ ভাল। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ডিম্বাণু দানে ইচ্ছুক মহিলার ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। গবেষণাগারে এই ডিম্বাণুর সঙ্গে যিনি সন্তান চান তাঁর স্বামীর শুক্রাণুর মিলন ঘটিয়ে ভ্রূণ তৈরি করা হয় এবং তা জরায়ুতে স্থাপন করা হয়।

ভ্রূণ দানে অন্য কোনও মহিলার ডিম্বাণু এবং অন্য কোনও পুরুষের বা সেই মহিলার স্বামীর শুক্রাণুর মিলন ঘটিয়ে নিষিক্ত

ভ্রূণ সন্তান লাভে ইচ্ছুক মহিলার গর্ভে স্থাপন করা হয়।

ডোনার স্পার্ম আই ভি এফ

অনেক সময় স্বামীর শুক্রাণু থাকে না। কিন্তু স্ত্রীর ডিম্বাণু থাকে। এরকম ক্ষেত্রে অন্য পুরুষের শুক্রাণু আই ভি এফের সাহায্যে ওই স্ত্রীর ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করা হয়। ভ্রূণটি ওই স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করাকেই বলে ডোনার স্পার্ম আই ভি এফ।

হিমঘরে হিল্লে

স্বাভাবিকভাবে যখন মেয়েদের শরীরে প্রতিমাসে ডিম্বাণু তৈরি হয় তার সংখ্যা এক বা দুই হলেও ডিম্বাশয় থেকে মাসে অন্তত ১৫-২০টি ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকে। আই ভি এফ পদ্ধতিতে সমস্ত ডিম্বাণু বের করে ল্যাবরেটরিতে শুক্রাণুর সঙ্গে মিলন ঘটালে একাধিক ভ্রূণ তৈরি হয়। এর মধ্যে থেকে মাত্র একটি জরায়ুতে স্থাপন করা হয় আর বাকিগুলো -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে রেখে দেওয়া হয়। একে বলে ফ্রোজেন এমব্রায়ো। প্রথমবার চেষ্টায় যদি কাজ না হয়, গর্ভপাত হয়ে যায় তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় এমব্রায়ো স্থাপন করা হয়। যদিও সরাসরি নয়, ফ্রোজেন এমব্রায়ো রাখতে হয় ধাপে ধাপে। এইভাবে রাখা এমব্রায়ো ৫ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বোপরি ফ্রোজেন এমব্রায়ো ব্যবহারে সাফল্যের হার বেশ ভাল।

খরচা-পাতি

অনেকের এখনও ধারণা আছে আই ভি এফ-এর জন্য প্রচুর খরচ। যদিও বাস্তব তা নয়। এর জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তেমন দাম নয়, ওযুধপত্রের দামও সাধ্যের মধ্যেই। ফলে আজকের দিনে শুধু উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত নয়, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষরাও এই পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তানের মুখ দেখতে পারছেন।

> ৩৫ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে **সন্তান জন্ম দেওয়ার হার** কমতে থাকে। প্রতি এক বছরে ২-৬% হারে কমে। কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারী শরীরে ওভারির কার্যক্ষমতা ও ভাল কোয়ালিটির ডিম্বাণু সৃষ্টির **মাত্রা কমতে থাকে।** কাজেই যত কম বয়সে এই চিকিৎসা শুরু করা যায় **সাফল্যের হার** ততই বৃদ্ধি পায়।

শুয়ে বসে

আই ভি এফ পদ্ধতিতে গর্ভ সঞ্চারের পর শুয়ে বসে থাকতে হবে বলে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে। যে কোনও মহিলার পক্ষেই ন-মাস শুয়ে থাকা বিড়ম্বনার। তার ওপর যাঁরা কোনও না কোনও পেশার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের তো টানা ছুটি নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এ সব ভেবে অনেকেই পিছিয়ে যান। যদিও এই ধারণা অমূলক। ভ্রূণ গর্ভে স্থাপন করার পর ১৫ দিনেই বোঝা যায় সেটি গর্ভে গেঁথে গিয়েছে কী না, গেঁথে গেলেই ধরা হয় গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। ভ্রূণ স্থাপনের ঘণ্টা দুয়েক পর মহিলাকে বাড়ি গিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম, হাঁটা চলা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিছানায় শুয়ে থাকার কোনও দরকার হয় না। তবে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করাই শ্রেয়।

বয়স বিবেচনা

আই ভি এফ পদ্ধতির সাফল্যের পিছনে মহিলাদের বয়স গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৩৫ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্তান জন্ম দেওয়ার হার কমতে থাকে। প্রতি এক বছরে ২-৬% হারে কমে। কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারী শরীরে ওভারির কার্যক্ষমতা ও ভাল কোয়ালিটির ডিম্বাণু সৃষ্টির মাত্রা কমতে থাকে। কাজেই যত কম বয়সে এই চিকিৎসা শুরু করা যায়

সাফল্যের হার ততই বৃদ্ধি পায়।

সামান্য সমস্যা

আই ভি এফ পদ্ধতির খুব জটিল কোনও সাইড এফেক্টস নেই। কখনও কখনও ভ্রূণ তৈরির সময় মহিলার তলপেট ভারী লাগে, কিংবা ব্যথা হয়। কারও বেশি কিংবা অনিয়মিত পিরিয়ড দেখা দেয়। খুব সামান্য ক্ষেত্রে ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন সিনড্রোম নামে সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বুকে, পেটে জল জমে শ্বাসকষ্ট হয়। তবে সবই খুব অল্প সময়ের উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয়। উপযুক্ত চিকিৎসায় এসব সমস্যার সমাধান সহজেই সম্ভব।

সারোগেট মাদার

আমির খান এবং কিরণ রাও-এর মতো সেলিব্রিটি ‘সারোগেট মাদার’ নেওয়ার কথা স্বীকার করে নিলেও এখনও অনেকেরই এ বিষয়ে মুখে কুলুপ। সারোগেট মাদার অর্থাৎ যিনি সন্তান ধারণ করেন এবং কমিশনিং পেরেন্ট অর্থাৎ যাঁদের সন্তান ধারণ করেন দুপক্ষই এ ব্যাপারে কোনও কিছু জানাতে নারাজ। অথচ পরিসংখ্যান বলছে, সমস্ত দেশে চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারোগেট মাদারের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।

সারোগেট মাদার বলতে কী বোঝায়? লাতিন শব্দ সারোগেটাস এর ইংরেজি অর্থ সাবস্টিটিউশন। বাংলায় একে বলা যায় বিকল্প পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যা করা হয় তা হল, যখন কোনও স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম হন, তাঁর হয়ে এই কাজটা করেন অন্য কোনও মহিলা। যিনি সন্তানটি ধারণ করছেন তিনিই সারোগেট মাদার নামে চিহ্নিত হন। এক্ষেত্রে আই ভি এফ পদ্ধতির মাধ্যমে ভ্রূণ তৈরি করে সারোগেট মাদার বা ধারক মায়ের গর্ভে স্থাপন করা হয়। সারোগেট মাদার ভ্রূণ গর্ভে ধারণ করেন, নির্দিষ্ট সময়ের পর বাচ্চার জন্ম দেন এবং শিশু জন্মানোর পর তা কমিশনিং পেরেন্ট-এর হাতে তুলে দেন।

সারোগেট মাদার শুধুমাত্র বাচ্চাটা ধারণ করেন। তাঁর ডিম্বাণুও ব্যবহার করা হয় না। কমিশনিং পেরেন্টদের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর ল্যাবরেটরিতে মিলন ঘটিয়ে তৈরি করা হয় এমব্রায়ো। এই এমব্রায়ো সারোগেট মাদারের জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। কখনওই শারীরিক মিলনের মাধ্যমে এটা করা যায় না।

নানা কারণে সারোগেট মাদার এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোনও মহিলা যদি ফ্যালোপিয়ান টিউব, ইউটেরাস কিংবা ওভারির সমস্যাজনিত কারণে গর্ভসঞ্চারে অক্ষম হন তখন এই পদ্ধতির কথা ভাবা হয়। যদিও এর আগে চিকিৎসকরা অন্যভাবে সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেন। ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লক থাকলে তা সারিয়ে তোলা হয়। এছাড়াও নানা পদ্ধতিতে চেষ্টা করা হয় স্বাভাবিক সন্তান ধারনের। কখনও কখনও ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন বা আই ইউ আই-এর মাধ্যমে স্বামীর সবল শুক্রাণু ক্যাথিটারের সাহায্যে স্ত্রীর জরায়ুতে পৌঁছে দেওয়া হয়, যাতে সন্তান ধারণ সম্ভব হয়। কিন্তু যদি দেখা যায় জটিল কোনও অস্ত্রোপচার, শারীরিক ত্রুটি, জেনিটাল টিবি, হিস্টেরেকটোমি, ক্যানসার কিংবা কোনও মারাত্মক সংক্রমণের কারণে কোনওভাবেই কোনও স্ত্রীর পক্ষে সন্তান ধারণ সম্ভব নয় তখন সারোগেট মাদারের প্রয়োজন হয়।

যদি দেখা যায় কোনও স্ত্রীর ইউটেরাস, ওভারি দুটোরই সমস্যা আছে তখন অন্য মহিলার ওভাম সংগ্রহ করে স্বামীর স্পার্মের সঙ্গে নিষেক ঘটানো হয়। এইভাবে তৈরি ভ্রূণ ধারণ করেন সারোগেট মাদার। দেখা গিয়েছে প্রথমবার এই পদ্ধতির সাফল্যের হার ৩০-৪০ শতাংশ। দ্বিতীয়বারে আরেকটু বাড়ে। তৃতীয়বারে ৮০-৯০ শতাংশ সাফল্য আসে।

সারোগেট মাদার নির্বাচিত করার আগে কয়েকটি বিষয় দেখে নেওয়া হয়। যেমন, নিজের কোনও বায়োলজিক্যাল সন্তানের যেন আগে জন্ম দিয়ে থাকেন। অন্তত পক্ষে এক সন্তানের জননী হতে হবে। নয়তো শিশু জন্মানোর পর তা ফেরত দিতে না-ও চাইতে পারেন। পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় তাঁর শারীরিক কোনও সমস্যা বিশেষ করে রুবেলা, হেপাটাইটিস-এ, বি, সি আছে কিনা, পিরিয়ড স্বাভাবিক কিনা, ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা আছে কিনা। এসব সমস্যা থাকলে তিনি সারোগেট মাদার হতে পারেন না। এছাড়াও দেখে নিতে হয় সেই মহিলার তামাক বা অ্যালকোহলের নেশা আছে কিনা, এরকম কিছু থাকলে সন্তান প্রসবে সমস্যা হতে পারে।

তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এই পদ্ধতি যেন ব্যবসায়িকভাবে প্রয়োগ করা না হয়। নিজে ১০ মাস গর্ভে ধারণ করার ঝক্কি পোহাবো না বলে অন্যকে দিয়ে টাকার বিনিময়ে সন্তান ধারণ করানো কখনওই সমর্থনযোগ্য নয়। একেবারেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টা নেওয়া উচিত। চিকিৎসার একটা পদ্ধতি হিসেবেই ব্যবহার করা উচিত।

দুই মায়ের কথা

ঈলিনা বণিক

অনিন্দিতা সর্বাধিকারী

পরিবর্তনটা শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের সমাজেও। বিবাহিত না হয়েও সন্তান ধারণে কিছু মহিলা এখন আর কোনওরকম দ্বিধাবোধ করছেন না। বিয়ে না করে সন্তান কখনওই কাম্য নয়— বহু বছর ধরে সমাজের বুকে জমাট বাঁধা এই সংস্কারকে এক লহমায় সরিয়ে দিয়ে মা হচ্ছেন বেশ কিছু একক মহিলা। সবচেয়ে বড় কথা এ বিষয়ে তাঁরা কোনও রাখঢাক করছেন না। আমার সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত একান্তই আমার, পুরুষের শুধুমাত্র প্রয়োজন 'স্পার্ম'টার জন্য। সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের জন্য নয়। অনেকে স্পার্ম ব্যাঙ্ক থেকে স্পার্ম সংগ্রহ করে মা হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা জানতেও আগ্রহী নন, কার স্পার্ম তাঁরা নিলেন। আর এ বিষয়ে কলকাতার যে দুই সেলিব্রিটি মহিলার কথা উল্লেখ করতেই হয় তাঁদের একজন বিখ্যাত পেন্টার ঈলিনা বণিক আর অন্যজন চিত্র পরিচালক অনিন্দিতা সর্বাধিকারী। দুজনেই সিঙ্গল মাদার। ঈলিনা ডিভোর্সি এবং তিনি জানেন কার স্পার্ম ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর শরীরে সন্তানের আগমনের জন্য। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হল, অচেনা লোকের স্পার্ম ব্যবহারে আমার আপত্তি ছিল। কারণ শিশু বড় হয়ে যদি জানতে চায় এ বিষয়ে তাহলে তাকে সত্যিটা জানানো উচিত। রাইট টু ইনফর্মেশন এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শিশুকে জানাতে হবে। তা না জানালে শিশুর মধ্যে দেখা দিতে পারে আইডেনটিটি ক্রাইসিস। তাই তিনি সব বিষয়ে ক্লিয়ার থাকারই পক্ষপাতী। যদিও তাঁর সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব তিনি একাই নিয়েছেন। মেয়ে অমরাবতী এখন নয়নের মণি।

অন্যদিকে অনিন্দিতা সর্বাধিকারী অবিবাহিত, কিন্তু কবে বিয়ে হবে তারপর সন্তান ধারণ করতে যদি দেরি হয়ে যায়, তাই বিয়ে যবে হোক বা না হোক, সন্তান চাই, এই চিন্তাভাবনা থেকেই তিনি যোগাযোগ করেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে। পুরোপুরি বাণিজ্যিকভাবে ফর্ম ফিলআপ করে নিজের গর্ভসঞ্চার ঘটিয়েছেন। এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাপোর্টার হিসেবে পাশে পেয়েছিলেন তাঁর বাবা, মা-কে। অনিন্দিতা তাঁর কয়েক মাসের সন্তান-এর পিতৃ পরিচয় নিয়ে একটুও চিন্তিত নন। তাঁর সাফ কথা, আমার সন্তানের আমিই মা, আমিই বাবা। পুরুষদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ থেকে নয়, নিজের ইচ্ছেতেই নিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত। যদিও এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে বেশ খানিকটা সময় নিয়েছেন তিনি। প্রথমবার চেষ্টায় সাফল্য আসেনি। সেবার অ্যাবরশন হয়ে যায়। কিন্তু এতেও হাল ছাড়েননি। আবারও চেষ্টা করেন এবং সফল হন। সন্তানের জন্ম দিয়ে গর্বিত মা অনিন্দিতা।

অনেকেই বলতে পারেন, মা হওয়ার জন্য সন্তান দত্তক তো নেওয়া যেত। কিন্তু দত্তক সন্তান তো পুরোপুরি অন্যের সন্তান। নিজের শরীরে তিল তিল করে বড় করে তোলা, একটু একটু করে তার উপস্থিতি অনুভব করার মধ্যে যে আনন্দ তা বোধহয় থাকে না। তাই সন্তানের জন্ম দেওয়ার অনুভূতি পাওয়ার জন্য এখন অনেকেই দ্বারস্থ হচ্ছেন আই ভি এফ পদ্ধতির। কারও তোয়াক্কা না করে একক মহিলারা নিজেই জন্ম দিচ্ছেন আত্মজর।

বি: দ্র: বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত তথ্য

উত্তর কলকাতায় প্রথম
কিডনির অসুখে উন্নত প্রযুক্তিগত
লেজার সার্জারি

LASER SURGERY
HOLMIUM

@Eskag SANJEEVANI Bagbazar

	TURP	LASER
1 Invasiveness	Minimum	Minimum
2 Post operative Pain	Minimum Pain	Painless
3 Energy used	Electric	Laser beam
4 Hospital Stay	More	Less
5 Resume normal Activities	Late	Early
6 Blood Loss	Yes	Negligible
7 Sexual side effect	Present	Nil
8 Anticoagulant taking Pt	Need to stop	No need to stop
9 Normal saline resection	Not possible	Possible

২৪x৭ দিন একই ছাদের তলায় পাবেন
সবরকম আধুনিক চিকিৎসা ও অসুখ অনুসন্ধান পদ্ধতি

সিটি স্ক্যান
মাল্টি স্লাইস

+ এমারজেন্সি
+ ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট
+ ডায়ালিসিস
+ কম্পিউটার চালিত প্যাথলজিকাল অনুসন্ধান পদ্ধতি
+ আধুনিক অসুখ নির্ণয় প্রযুক্তি

- খরচ আয়ত্ত্বের মধ্যে
- হাসপাতালের রোগী বা অনুন্নত শ্রেণীর রোগীদের জন্য পি পি পি রেট চালু
- গত কয়েক বছর সরকারি ও সরকারি আন্ডারটেকিং সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে জড়িত

Renew life afresh

Eskag SANJEEVANI MULTISPECIALITY HOSPITAL

ESKAG SANJEEVANI PVT. LTD.

For any kind of Information/Assistance
Please Feel Free To Contact Ph: 4025 1800,2554 1818(20 Lines)
Website: www.eskagsanjeevani.com /E-mail: info@eskagsanjeevani.com

গর্ভধারিনী মা-র আইনি অবস্থান

সারোগেসি সম্পর্কে কী বলছে আমাদের দেশের আইন? জানাচ্ছেন বিশিষ্ট আইনজীবি **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

আমাদের দেশে সারোগেট মাদারস-এর বিষয়ে লিগাল রেগুলেটেড অ্যাক্ট বলে কিছু নেই। যদিও সারোগেসি আইনসিদ্ধ। এ বিষয়ে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকাল রিসার্চ সংক্ষেপে আই সি এম আর যে ন্যাশনাল গাইডলাইন করে দিয়েছে সেটাই মেনে চলা উচিত। যদিও মনে রাখতে হবে এটা কেবলমাত্র গাইড লাইন। বলা হয়েছে, যে মহিলার উম্ব বা জরায়ু ভাড়া করে কোনও দম্পতির সন্তান তাতে বেড়ে উঠবে তার সঙ্গে দম্পতির একটা চুক্তিপত্র থাকা দরকার। যদিও এই গাইডলাইনে উল্লেখ নেই যদি কেউ এই চুক্তি না মানে তাহলে তার কী ধরনের শাস্তি হতে পারে। তখন শিডিউল আইন অনুযায়ী চুক্তি ভাঙার যা যা শাস্তি হয় তাই হবে।

আই সি এম আর ২০০৫ সালে অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি বা সংক্ষেপে এ আর টি-র জন্য গাইডলাইন ঠিক করে। ল কমিশন এ বিষয়ে রিপোর্ট সাবমিট করেছে। যদিও এখনও আইন কিছু তৈরি হয়নি।

ল কমিশন যে দিকগুলোর কথা উল্লেখ করেছে তা হল

- কমিশনিং পেরেন্ট অর্থাৎ যাঁরা বাচ্চাটা চাইছেন তাঁদের

সঙ্গে সারোগেট মাদার অর্থাৎ যিনি ভ্রূণ গর্ভে ধারণ করছেন—এই দুই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে একটা চুক্তি হওয়া দরকার। এই চুক্তিপত্রে সমস্ত কিছু পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যেমন, সারোগেট মাদারের স্বেচ্ছায় অনুমতি থাকবে বাচ্চাটা ধারণ করার, সেই মহিলার স্বামী এবং পরিবারের অন্যদেরও এতে সায় থাকতে হবে। এছাড়া আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন-এর মেডিকাল প্রসিডিওর কী হবে, বাচ্চা ধারণ করাকালীন চিকিৎসার যাবতীয় খরচ এবং বাচ্চা জন্মানোর পর তা কমিশনিং পেরেন্টকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ করতে হবে চুক্তিপত্রে। তবে কখনওই 'কমার্শিয়াল'ভাবে এই পদ্ধতিকে নেওয়া যাবে না।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি কমিশনিং পেরেন্ট-এর দুজনের কিংবা কোনও একজনের মৃত্যু হয় অথবা দুজনের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে শিশুর কী ভবিষ্যৎ হবে তার উল্লেখ থাকা দরকার চুক্তিপত্রে। এমনও হতে পারে বাচ্চা জন্মানোর পর আর তাঁরা নিতে চাইলেন না তখন কী করণীয় এ সমস্ত কিছুরই উল্লেখ রাখতে হবে।

- যে শিশুটি জন্মাবে তার দেখাশোনার জন্য খরচের ব্যাপারটার কথা মাথায় রাখতে হবে, বিশেষ করে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি কমিশনিং পেরেন্ট-এর দুজনের কিংবা কোনও একজনের মৃত্যু হয় অথবা দুজনের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে শিশুর কী ভবিষ্যৎ হবে তার উল্লেখ থাকা দরকার চুক্তিপত্রে। এমনও হতে পারে বাচ্চা জন্মানোর পর আর তাঁরা নিতে চাইলেন না তখন কী করণীয় এ সমস্ত কিছুরই উল্লেখ রাখতে হবে।
- প্রসবের সময় যদি সারোগেট মাদার-এর মৃত্যু হয় সেই দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে ইনসিওরেন্স কভারেজ-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- কমিশনিং পেরেন্টদের মা বাবা-র মধ্যে অন্তত একজনের স্পার্ম বা ওভাম ব্যবহার করতে হবে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের সময়। এতে বাচ্চার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুন্দর হতে সাহায্য করে।
- হাসপাতালে শিশু জন্মানোর পর বার্থ সার্টিফিকেটে কমিশনিং বাবা-মার নাম থাকতে হবে।
- কোন মহিলা সন্তানটি জন্ম দিয়েছেন তা গোপন রাখাই ভাল।
- যে সন্তানটির জন্ম দেবে তা ছেলে বা মেয়ে হবে তা আগে থেকে ঠিক করা হবে, এ ধরনের নির্বাচন একেবারেই নিষিদ্ধ।
- যদি ভ্রূণ স্থাপনের পর অ্যাবরশন করাতে হয় তাহলে মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট ১৯৭১-এ যে যে নিয়মে একে আইনসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে সেই আইন মোতাবেক যেন হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।
- সবশেষে, যেটা বলতেই হবে তা হল আমাদের দেশে এখন সারোগেট মাদারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, এই পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত দুধরনের ব্যক্তির ভবিষ্যতের কথা ভেবে, আইন করাটা খুবই জরুরি। শুধু গাইডলাইন দিয়ে কাজের কাজ হওয়া একটু অসুবিধার।

ছোট মাছের পাঁচ-সাত

বাঙালি মৎস্যপ্রিয় জাত। রুই-কাতলা-ইলিশ ছাড়াও হাজারো ছোট মাছ দিয়ে সুস্বাদু, লোভনীয় টক-ঝাল, চচ্চড়ি রান্না বাঙালি করে থাকে। সেই বিশাল সম্ভার থেকে সাতটি বেছে নিয়েছেন **ইন্দ্রাণী গুহ** আপনাদের জন্য

কাঁচকি মাছের চচ্চড়ি

কী কী লাগবে

কাঁচকি মাছ : ২৫০ গ্রাম ; পেঁয়াজ : ৩ টি (মাঝারি) ; রসুন : ১৫ কোয়া (মাঝারি) ; বেগুন : ১ টা (মাঝারি) ; কাঁচালঙ্কা : ৪ টে ; হলুদ গুঁড়ো : পরিমানমতো ; লঙ্কাগুঁড়ো : পরিমানমতো ; নুন : পরিমানমতো ; তেল : পরিমানমতো।

কী করে করবেন

কাচকি মাছ কাটার দরকার নেই। খুব ভাল করে ৭/৮ বার ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। হলুদ ও নুন মেখে, মাছটা ভাল করে ভেজে নিন। বেগুন লম্বা, সরু করে কেটে ভেজে রাখুন। কড়াতে একটু বেশি তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি ও রসুন কুচি দিয়ে ভাজুন। সোনালি রঙ ধরলে, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ও নুন দিয়ে, একটু কষিয়ে, তাতে সামান্য জল দিন। জলের উপর বেগুন ভাজা ও মাছ ভাজা ছড়িয়ে দিয়ে, তার উপর কাঁচালঙ্কা চিরে দিন। দুই মিনিট ঢেকে রাখুন। রান্না শেষ। গরম গরম ভাতের সঙ্গে কাঁচকি মাছের চচ্চড়ি, দারুন জমবে।

ট্যাংরা মাছের ঝাল

কী কী লাগবে

ছোট ট্যাংরা : ২৫০ গ্রাম ; বেগুন : ১ টা ; হলুদ গুঁড়ো : পরিমান মতো ; লঙ্কা গুঁড়ো : পরিমান মতো ; নুন : আন্দাজ মতো ; কাঁচালঙ্কা : ৪/৫ টা ; ধনেপাতা : ১/২ আঁটি ; তেল : ৪ টেবিল চামচ ; কালোজিরে : সামান্য ; টোম্যাটো : ১ টা।

কী করে করবেন

মাছ কেটে ভাল করে ধুয়ে, নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াতে তেল দিয়ে, মাছগুলো ভাল করে ভেজে তুলুন। কড়াতে একটু বেশি তেল দিয়ে তাতে কালোজিরে ও ১টা লঙ্কা চিরে দিন। একটা বাটিতে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ও নুন, একটু জল দিয়ে গুলে, কড়াতে ঢেলে দিন। বেগুনটা আগে থেকেই ছোট ছোট লম্বা টুকরো করে কেটে, ভেজে রাখুন। ওই বেগুনভাজা ও মাছ ভাজা কড়াতে ছেড়ে দিন। সঙ্গে টুকরো করে কাটা টোম্যাটোও দিয়ে দিন। এ-পিঠ ও-পিঠ করে তাতে অল্প জল দিন, যাতে মাখা মাখা হয়। নামাবার আগে কাঁচা লঙ্কা চিরে এবং ধনেপাতা কুচি করে, মাছের উপর ছড়িয়ে দিন। যাঁরা, পেঁয়াজ-রসুন কম পছন্দ করেন, তাঁদের ট্যাংরা মাছের ঝাল খুবই ভাল লাগবে।

কাজুরি মাছের সর্ষে ঝাল

কী কী লাগবে

কাজুরি মাছ : ২৫০ গ্রাম ; কাঁচা লঙ্কা : ৮/১০ টা ; সর্ষে বাটা বা গুঁড়ো : ৪ চামচ ; হলুদ গুঁড়ো : পরিমান মতো ; নুন : আন্দাজমতো ; ধনেপাতা : ১/২ আঁটি ; তেল : ৪ টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

কাজুরি বা কাজরি মাছ খুব নরম মাছ। মাছ ভাল করে ধুয়ে হলুদ-নুন মাখিয়ে রাখবেন। খুব সাবধানে ভাজবেন, নরম মাছ বলে, ভেঙে যেতে পারে। একটা ছোট বাটিতে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো ও নুন, জল দিয়ে গুলে রাখুন। কড়াতে দুই চামচ তেল দিয়ে তাতে হলুদ-নুন-গোলা জলটা দিন। মশলাটা ভাজা ভাজা হলে, সর্ষে ও কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে, সামান্য জল দিন। জলের উপর ভাজা মাছগুলো সাজিয়ে দিন এবং উপরে ৩/৪টা লঙ্কা চিরে ছড়িয়ে দিন। ২/৩ মিনিট মাছটা ঢেকে রাখুন। নামানোর আগে, মাছের উপর বাদবাকি সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিন। ইচ্ছে করলে, ধনে পাতা কুচিও ছড়িয়ে দিতে পারেন। কাজরি মাছের সর্ষে ঝাল এত উপাদেয় যে ওই এক পদ দিয়েই সব ভাত খাওয়া হয়ে যায়।

মৌরলা মাছের চচ্চড়ি

কী কী লাগবে

মৌরলা মাছ : ২৫০ গ্রাম ; পেঁয়াজ : ৩ টি (মাঝারি) ; রসুন : ১৪-১৫ কোয়া ; বেগুন : ১টি ; কাঁচা লঙ্কা : ৪/৫ টা ; হলুদগুঁড়ো : পরিমানমতো ; লঙ্কাগুঁড়ো : পরিমানমতো ; নুন : আন্দাজমতো ; তেল : ৪ টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

মৌরলা মাছের পেট গেলে, ভাল করে ধুয়ে, হলুদ-নুন মাখিয়ে রাখুন। পেঁয়াজ-রসুন এক জায়গায় কুচিয়ে রাখুন। বেগুন লম্বা লম্বা সরু সরু করে কেটে নিন। লঙ্কা গুলো চিরে নিন। কড়াতে তেল দিয়ে, মাছগুলো সোনালি রঙ করে, ভেজে তুলুন। বেগুনগুলোও ভেজে নিন। কড়াতে একটু বেশি তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ, রসুন, কুঁচো ছেড়ে দিন। সোনালি রঙ ধরলে, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো নুন দিন। মশলা ভাজা ভাজা হলে, অল্প জল দিয়ে তার উপরে মাছভাজা ও বেগুনভাজা ছড়িয়ে দিন। ওপরে কাঁচা লঙ্কা চিরে ঢেকে রাখুন। ২/৩ মিনিট পর, ঝোল, গা -মাখা মাখা হলে কড়া নামিয়ে ফেলুন। মৌরলা মাছের চচ্চড়ি তৈরি।

পুঁটি মাছের টক

কী কী লাগবে

পুঁটি মাছ : ২৫০ গ্রাম ; হলুদ গুঁড়ো: প্রয়োজনমতো ; নুন : প্রয়োজনমতো ; তেঁতুল : সামান্য ; সর্ষে : ১ চা চামচ ; চিনি : ২ চা চামচ (স্বাদমতো) ; তেল : ২ টেবিল চামচ।

কী করে করবেন

মাছগুলো ধুয়ে, ভাল করে ভেজে হলুদ-নুন মাখিয়ে ভেজে তুলুন। তেঁতুল জলে গুলে একটা কাথ তৈরি করুন। বিচি ও ছিবড়ে ফেলে দেবেন। কাথটা একটু পাতলা হবে। কড়াতে ১ চা-চামচ তেল দিয়ে, গরম হলে, তাতে সর্ষে ফোড়ন দিন। হলুদ ও নুন সামান্য জলে গুলে সর্ষের উপর ঢেলে দিন। মশলা ভাজা-ভাজা হলে, তাতে তেঁতুলের কাথ সবটা দিয়ে দিন। ফুটে উঠলে, মাছ-ভাজা দিন। ২/৩ মিনিট ফোটার পর, তাতে স্বাদমতো চিনি দিয়ে, ১ মিনিট পর নামিয়ে দিন। হয়ে গেল পুঁটি মাছের টক।

চিংড়ি মাছের বাটি চচ্চড়ি

কী কী লাগবে

চিংড়ি মাছ (ছোট) : ২৫০ গ্রাম ; ঝিঙে : ২টি (বড়) ; আলু : ২ টো (মাঝারি) ; পেঁয়াজ : ৩ টি (মাঝারি) ; কাঁচা লঙ্কা : ৪/৫ টি ; হলুদ গুঁড়ো : আন্দাজমতো ; লঙ্কা গুঁড়ো : পরিমানমতো ; নুন : স্বাদমতো ; তেল : ৩ টেবিল চামচ ; চিনি : ১ চা-চামচ।

কী করে করবেন

চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করে কেটে, ধুয়ে, হলুদ-নুন মাখিয়ে নিন। কড়াতে সবটা তেল দিয়ে দিন। চিংড়িমাছ, ছোট-ছোট চৌকো, করে কাটা আলু ও ঝিঙে দিন। পেঁয়াজ কুচি, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ও নুন দিয়ে ভাল করে নেড়ে, অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন। আস্তে আস্তে রান্না হতে থাকবে। তরকারি ও মাছ থেকে জল বার হয়ে, তাতেই সব সেদ্ধ হবে। কোনও জল দিতে হবে না। সেদ্ধ হয়ে গেলে, সামান্য একটু চিনি ও আস্ত কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। একটু ঝোল-ঝোল ভাব বেশি হলে, সামান্য আটা বা ময়দার গুঁড়ো দিয়ে দিন, যাতে চচ্চড়িটা মাখা-মাখা হয়। চচ্চড়ি জিনিসটা এমনই, যে তাতে ঝোল থাকে না এবং ঝোল থাকলে স্বাদও ভাল হয় না। চিংড়ি মাছের বাটি চচ্চড়ি অনেকেরই প্রিয় খাবার।

পারশে মাছের সর্ষে ঝাল

কী কী লাগবে

পারশে মাছ : ২৫০ গ্রাম ; কাঁচা লঙ্কা : ১০/১২ টা ; ধনেপাতা : ১/২ আঁটি ; হলুদ গুঁড়ো : পরিমানমতো ; নুন : আন্দাজমতো ; তেল : ৪ টেবিল চামচ, সর্ষে ২ বড় চামচ।

কী করে করবেন

মাছগুলো খুব ভাল করে ধুয়ে হলুদ-নুন মাখিয়ে ভেজে তুলুন। খেয়াল রাখবেন খুব কড়া ভাজা যেন না হয়। সর্ষে, সামান্য নুন ৫/৬টা কাঁচা লঙ্কা, সামান্য হলুদ ও ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে নিন কড়াতে ১ চা-চামচ তেল দিন। একটা ছোট বাটিতে একটু হলুদ ও স্বাদমতো নুন জলে গুলে রাখুন। তেল গরম হলে, তাতে হলুদ গোলা ঢেলে দিন। এক মিনিট পরে সর্ষে বাটাটা একটু জলে গুলে, কড়ায় ছাড়ুন। তার উপর মাছগুলো সাজিয়ে দিন। কড়া ঢেকে দিন। ২/৪ মিনিট পর ঢাকনা খুলে, তাতে ৪/৫টি আস্ত কাঁচা লঙ্কা ও বাদবাকি তেল ছড়িয়ে দিন। পারশে মাছের সর্ষে ঝাল তৈরি। এখন পাতে দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

সঠিক হজমের উপাদান...

ENHANCING DIGESTION 25 YEARS AND BEYOND

Encarmin

Syrup & Drop

আপনার ডাক্তার সব জানে

ডাক্তারের পরামর্শ বা অনুমোদন অনুযায়ী ওষুধ নেবেন।

নারীকেন্দ্রিক ছবি আজ বিনোদন ও বাণিজ্য

'কাহানি' ছবিতে বিদ্যা বালন

মহিলাদের চরিত্রায়ণ সম্পর্কে কিছু সাবেকি ধারণা ছিল বা হয়তো এখনও আছে! সেগুলোকে ভেঙে কী করে নানা ভাষার, নানা ধরনের ছবি আজ মহিলাদের অন্য রূপ উন্মোচন করছে তারই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন অভিজিৎ গুহ

সিনেমার কেন্দ্রে নারী চরিত্র, তাকে ধরেই গল্প, এমনটা কালেভদ্রে দেখা যায়। তা সে বাংলা সিনেমাই হোক, অথবা অন্য ভারতীয় ভাষায় তৈরি ছবি। শুধু দেশে নয়, খোদ হলিউডেও এমন নিদর্শন কম মেলে। কারণটা কী? একা একটি মহিলার ঘাড়ে বন্দুক রেখে বাণিজ্যের বৈতরণী পার হওয়া দুষ্কর। আর তাই হয়তো এ দেশে, এমনকী বিদেশেও নায়িকার থেকে নায়কের রেমুনারেশন বেশি। এতে আশ্চর্য হওয়ার হয়তো কোনও কারণ নেই, কারণ আমাদের দেশে মেয়েদের নিয়ে এই দ্বিচারিতা সমাজের সর্বত্র। 'অচ্ছুৎ কন্যা' থেকে 'সুজাতা', হিন্দি ছবির পথ চলায় নারীকেন্দ্রিক গল্পের কথা হাতে গুণে বলা যায়। বিশেষত মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবিতে। 'হান্টারওয়ালি'—এ ক্ষেত্রে নিজস্ব বাণিজ্যিক ইতিহাস সৃষ্টি করে। সাধারণত মহিলাদের 'নায়ক' করে ছবি বানানোর যাবতীয় দায় বর্তায় অন্য ধারার ছবি

রাখি ও মুকুল পরমায়

'টেক ওয়ান' ছবির একটি দৃশ্য

করিয়েদের ওপর। এক সময় এই দায়িত্ব পালন করেছেন বিমল রায়, অমিয় চক্রবর্তীর মতো কিছু পরিচালক। পাশাপাশি বাংলায় ঋত্বিক, সত্যজিৎ তো ছিলেনই। সত্তর সালের গোড়ায় শ্যাম বেনেগল তাঁর 'ভূমিকা'-র মতো ছবির মধ্যে দিয়ে ধরেছিলেন মারাঠি অভিনেত্রী হানসা ওয়াডকরের সময় ও জীবনকে। বাংলায় তপন সিংহ রেপ ভিকটিম মহিলাকে কেন্দ্রে রেখে বানালেন 'আদালত ও একটি মেয়ে'। আশির দশকে হাল ধরলেন তাঁরই উত্তরসূরী অপর্ণা সেন, 'থার্টি সিক্স চৌরঙ্গী লেন' আর 'পরমা' বানালেন।

'পরমা' মধ্য আশির বাংলার প্রেক্ষাপটে একটা চমকে দেওয়া ছবি সন্দেহ নেই। একজন মধ্য বা উচ্চ মধ্যবিত্ত গৃহবধূর সামাজিক অবস্থানের সাহসী গল্প। যে ছবি গল্প বলায়, গভীর চরিত্র বিশ্লেষণে আর সিনেম্যাটিক অভিব্যক্তিতে জোরাল এক বার্তা বয়ে আনে। সেই সময় দর্শক মনে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে 'পরমা'। মহিলা হিসেবে অপর্ণাই এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর 'সতী' ছবিতে। আঘাত হানেন উনবিংশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। মনে পড়ে যায় তারও বেশ কিছু সময় আগের তৈরি রবীন্দ্রনাথের কাহিনি নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র'। 'গয়নার বাক্স'-ও তো সেই মুক্তির কথাই বলে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখার মায়ায় গল্প বলেন অপর্ণা সেন তিন সময়ের তিন মহিলার জীবন নিয়ে।

বিদ্যা বালন ও ইমরান হাসমি 'ডার্টি পিকচার'-এ

বাংলা সিনেমার পর্দায় মহিলাকে কেন্দ্র করে গল্প বলায় অন্যতম কিন্তু বন্ধু ঋতুপর্ণ। 'উনিশে এপ্রিল'-এর মা-মেয়ের গল্পই হোক আর 'দহন'-এর রমিতা (ঋতুপর্ণা) আর ঝিনুক (ইন্দ্রাণী), বাঙালি নারী মননের গভীরে ঢুকে যান তিনি। আবার নতুন করে ফিরে আসেন মা-মেয়ের ঘনিষ্ঠতা আর সংঘাত নিয়ে 'তিতলি'-তে। অথবা মধ্যবয়সী অবিবাহিতা মহিলার গোপন একাকিত্বে ঢুকে পরেন 'বাড়িওয়ালি' ছবিতে। এই বিষয়ে ঋতুপর্ণ-র বিচরণ ছিল অনায়াস।

সত্তর-আশির দশকে পশ্চিম আর দক্ষিণ ভারতে সরকারি বা বেসরকারি মদতে তৈরি হয়েছিল এক গুচ্ছ ছবি। সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ছবি দেশ বিদেশে প্রশংসাও কুড়িয়েছিল, তার মধ্যেও মণি মানিক্যের মতো চিক চিক করতে দেখা গেছে অনেক কাজ, যা ভারতীয় নারী মনের দরজা খুলে দেয়। গিরিশ কাসরাভাল্লির 'ঘটাশ্রাদ্ধ', প্রেমা কারান্থের 'ফনি আম্মা'-র মতো উদাহরণ আছে অনেক। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজ পৌঁছেছি দুহাজার দশের দশকে। হিন্দি সিনেমায় 'ইশকিয়া', 'ডার্টি পিকচার', 'কাহানি' ঘুরে আজকের 'গুলাব গ্যাং'-এ মেয়েদেরই জয়-জয়কার। প্রথাগত নিয়ম মেনে নায়িকার এই করা উচিত আর ওই করা উচিতের রেওয়াজ ভেঙে প্রায় যা ইচ্ছে তাই করবার জায়গায় চরিত্রগুলোকে নিয়ে গেছেন পরিচালকেরা। যথার্থ অর্থে 'লিবারেট' করার চেষ্টা করেছেন চরিত্রগুলোকে এবং দর্শক সেই ছবিগুলো মুক্ত মনে গ্রহণও করেছেন। বক্স অফিস কাঁপিয়েছেন মহিলা শিল্পীরা, হয়তো কোথাও কোথাও ব্যবসায় এগিয়ে গেছেন পুরুষ সহ শিল্পীদের ছাপিয়ে। ফর্মুলা ভেঙে তাই আজ সকলেই বেরোবার চেষ্টা করছেন। আদর্শ নারীর ভাবমূর্তি আজ এই সব ছবিতে ভেঙে খান খান। 'সাত খুন মাফ'-এ প্রতিশোধকামী মহিলা হয়ে ওঠেন নায়িকা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আজ তার সাতটি খুনকেও সমাজ অপরাধ বলে মনে করে না। 'কুইন'-এর রানি তার মধ্যবিত্ত ভয় ছেড়ে একাই পাড়ি দেয় বিদেশে। মৈনাক ভৌমিক 'আমি আর আমার গার্ল ফ্রেন্ডস'-এর ট্যাগলাইনে ছোট করে লিখতে পারেন 'সরি বয়েজ'। মহিলাদের আর পুরুষদের ঠিক তেমন ভাবে বোধহয় দরকার নেই। এ যেন বহু শতাব্দির বঞ্চনার অমোঘ প্রতিশোধ। একইভাবে দেখায় অভ্যস্থ সাবেকি মহিলার চরিত্র দেখতে দেখতে দর্শক আজ ক্লান্ত। 'টেক ওয়ান'-এর ধাক্কা না মারলে আধুনিক মনকে আর ছোঁয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না নতুন মানবীকে। সিনেমা পিছিয়ে থাকবে 'ক্লিশে'-র ঘেরা টোপে। কোনও শিল্পের কাছেই সেটা অভিপ্রেত নয়।

মাথা ব্যথার অভিজ্ঞতা প্রত্যেকেরই জীবনে কখনও না কখন হয়েই থাকে। মাথা থাকলে মাথা ব্যথা হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে কখনও মামুলি, কখনও বা জটিল অসুখের লক্ষণও হতে পারে এই মাথা ব্যথা। মাথা ব্যথা নিয়ে কখন মাথা ঘামাবেন, আর কখন ঘামাবেন না সে বিষয়ে বিস্তারিত জানালেন বিশিষ্ট চিকিৎসক **ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য।**

মাথা নিয়ে মাথাব্যথা

কারণ কী

কোনও একটা নয়, একাধিক বলা ভাল। বহু কারণ দায়ী মাথাব্যথার জন্য। মাইগ্রেন, টেনশন, মাথায় আঘাত লাগা, মস্তিষ্কের সংক্রমণে স্ট্রোক, চোখের সমস্যাকে মূলত মাথা ব্যথার জন্য দায়ী করা হলেও আরও নানা কারণে দেখা দিতে পারে এই সমস্যা।

টেনশন থেকে মাথাব্যথা

অনেক ক্ষেত্রেই মাথাব্যথার জন্য দায়ী টেনশন। টেনশন হেডেক বা ব্যথা হতে পারে মাথার একপাশে কিংবা পুরো মাথা জুড়ে। দিনের যে কোনও সময়ে যে কোনওদিন দেখা দিতে পারে এই সমস্যা। এর জন্য দায়ী মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অতিরিক্ত আবেগ, ঘুম না হওয়া, স্ট্রেন, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি। চিকিৎসকরা এই ধরনের মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রোগী বিশেষে কখনও সাইকোথেরাপি কখনও বিহেভিয়ারাল থেরাপি, কখনও আবার ড্রাগ থেরাপি অর্থাৎ ওষুধপত্রের সাহায্য নেন। এছাড়াও টেনশনজনিত মাথাব্যথা থেকে দূরে থাকতে চিকিৎসকদের পরামর্শ হল— নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করা, যোগাসন করা, হাঁটা, প্রাণায়াম করা, ভাল বই পড়া, সিনেমা-থিয়েটার দেখা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া এবং সবসময় হাসিখুশি থাকা।

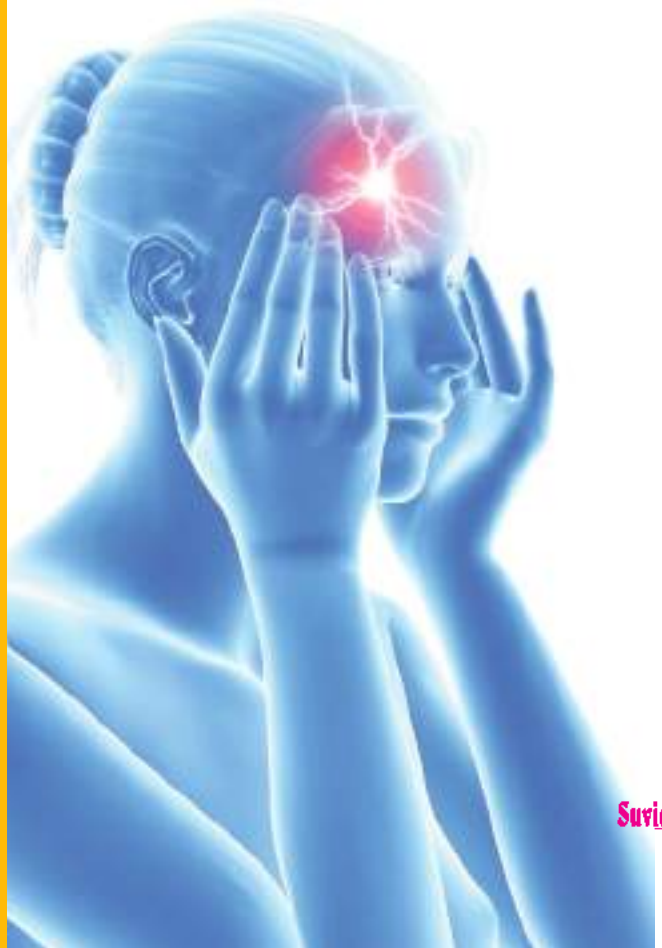

মাইগ্রেন যখন দায়ী

মাইগ্রেনের জন্য ছেলে, মেয়ে উভয়েরই মাথা ব্যথা হতে পারে। যদিও বয়ঃসন্ধির পর ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরই এই সমস্যা বেশি ভোগায়। মাইগ্রেন বা বাংলায় যাকে বলে আধকপালি তার কতগুলো বিশেষ লক্ষণ আছে। যেমন, শুরু হয় কপালের এক পাশে দপদপানি যন্ত্রণা দিয়ে, যন্ত্রণা চোখের কোটরে, ঘাড়ে এবং সারা শরীরে ছড়াতে পারে। এছাড়া গা গোলায়, বমি হয়, অনেকে আলো সহ্য করতে পারে না এমনকী কারও কথাও শুনতে চায় না। অনেকে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে। তবে দিন তিনেকের মধ্যে আবার রোগী সুস্থ হয়ে যায়। তখন আর কোনও সমস্যা থাকে না।

কিছু কিছু বিষয় মাইগ্রেন বাড়িয়ে তোলে। যেমন অতিরিক্ত ক্লান্তি, পরিশ্রম, উজ্জ্বল আলো, রাতে ঘুম না হওয়া, আইসক্রিম, চাইনিজ খাবার, চকোলেট, পনির, হঠাৎ কোনও মানসিক চাপের মধ্যে পড়া, এমনকী টানা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নিলেও মাইগ্রেন হতে পারে। মহিলাদের পিরিয়ডের আগে হরমোনের তারতম্যের জন্যও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মাইগ্রেন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বেশিরভাগ সময়েই ওষুধ খেতে হয়। সাধারণত ব্যথা কমানো, বমিভাব কাটানো এবং আনুষঙ্গিক সমস্যার কথা জেনে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। মাইগ্রেন এড়াতে চাইলে যে কারণে হতে পারে সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। উপোস করা চলবে না, টাইরামিন নামের পদার্থ যাতে বেশি থাকে যেমন ডুমুর, রেড ওয়াইন, মেটে, ডিম, কলা, বিন কিশমিশ ইত্যাদি খাবার বাদ দিতে হবে ডায়াট থেকে। খাওয়া চলবে না যে সব রান্নায় মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট থাকে তেমন খাবার। বিশেষত চিনে, জাপানি খাবার। অতিরিক্ত চা, কফি না খাওয়াই ভাল, অতিরিক্ত টেনশন করাও চলবে না।

নজরে চোখ

চোখ যেহেতু মাথার খুলির মধ্যে বসানো তাই চোখের সমস্যা হলে মাথাব্যথা হবে এটাই স্বাভাবিক, আঞ্জনি, আইরাইটিস, গ্লুকোমা ইত্যাদি যে কোনও কারণেই দেখা দিতে পারে মাথাব্যথার সমস্যা। চোখের পাওয়ারের গন্ডগোলেও মাথাব্যথা হতে পারে। বিশেষ করে, এক নাগাড়ে পড়াশোনা বা কম্পিউটারে কাজ করলে এই কষ্টদায়ক অনুভূতি হতে পারে। তেমন হলে চিকিৎসককে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াই উপযুক্ত কাজ হবে।

সাইনাসাইটিসও সমান দায়ী

সাইনাসের সমস্যার বেশিরভাগই হল সাইনাসাইটিস। আর এর অন্যতম উপসর্গ মাথার যন্ত্রণা। সাইনাসাইটিস জনিত মাথা যন্ত্রণার প্রধান লক্ষণগুলো হল মাথা ভার লাগা, অ্যাকিউট স্টেজে সূর্য

ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া, আবার সূর্যাস্তের পর ব্যথা কমে যাওয়া। এছাড়া নাক বন্ধ থাকা, পর পর ১৫-২০ টা হাঁচি, চোখ জ্বালা করা, গলার স্বরের পরিবর্তন, হল এর অন্যান্য উপসর্গ। সাইনাসের সমস্যার এত শত লক্ষণ দেখলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে গাফিলতি করবেন না। কারণ এর থেকে আরও জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপেও নজরদারি

উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও মাথা ব্যথা হতে পারে। অনেক সময়ই রোগী মাথাব্যথা উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গেলে পরীক্ষার পর জানতে পারেন তিনি হাই ব্লাড প্রেশারের রোগী। তবে উচ্চ রক্তচাপের জন্য মাথাব্যথার উপসর্গ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন মাথার ভার বা মাথা ধরা, বিশেষ করে মাথার পিছন দিকে ভার বোধ। যা কখনও বাড়ে কখনও কমে।

মাথা ভার বা মাথা ধরা ছাড়াও হাই ব্লাডপ্রেশারে মাথা ঘুরতে পারে, বমি হতে পারে। এছাড়া হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, অজ্ঞান হওয়া, পা ও পায়ের পাতা ফুলে যাওয়া, হঠাৎ করে ঘাম হওয়া, ক্লান্তি ইত্যাদি সমস্যাও হতে পারে। এ ধরনের সমস্যা হলে একটুও সময় নষ্ট না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। নয়তো অনেক বড় সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মেনোপজেও সতর্কতা

মেনোপজের পর যেহেতু ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন কমে যায় সেহেতু মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়, এর মধ্যে অন্যতম হল হট ফ্লাশ। হঠাৎ করে কপাল, ঘাড়, গলা, মাথা দিয়ে যেন গরম ভাপ বেরয়। আবার খানিক বাদে স্বাভাবিক হয়ে যায়। অনেকের এ সময় প্রচণ্ড ঘাম হয়, মাথা যন্ত্রণা হয়। হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির সাহায্যে এই সমস্যা থেকে সহজেই নিস্তার পাওয়া সম্ভব।

মনে রাখুন

- মাথাব্যথার সঙ্গে গা গোলানো কিংবা বমিভাব থাকলে, চোখের আশপাশে ব্যথা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।
- হঠাৎ করে মাথায় কোনও চোট লেগে বমি হলে বা ঘুম ঘুম ভাব, ক্লান্ত লাগলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দেরি করবেন না।
- মাথাব্যথার সঙ্গে নাক বন্ধ থাকা, নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, কাশি থাকলে ই এন টি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এটা নির্ঘাত সাইনাসাইটিসের মাথা ব্যথা।
- যদি পর পর কদিন ভোরবেলা মাথার যন্ত্রণা নিয়ে ঘুম ভেঙে যায় এবং এর সঙ্গে বমি ভাব কিংবা বমি হয়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। এর কারণ যেমন টেনশন, হাই ব্লাডপ্রেশার হতে পারে তেমনই ব্রেন টিউমারও হতে পারে। চিকিৎসক প্রয়োজন মতো বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষা করে রোগের প্রকৃত কারণ জেনে চিকিৎসা করান। কখনও কখনও সিটি স্ক্যান, এম আর আই, সাইটোলজি এবং লেসার-এর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করতে হয়।

পুজোর জন্য কিছু টিপস

প্রতি বছরের মতোই এ বছরও পুজো আসন্ন। গতমাস থেকেই রাস্তায় রাস্তায় পুজোর আগাম বার্তা নিয়ে হোর্ডিং পড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন বড় বড় দোকানে গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার মাঝে সেল দেওয়া শুরু হয়েছিল। সেই সেল-এও কেউ কেউ হয়তো পুজোর বাজার কিছুটা সেরে ফেলেছেন। তবে আসল বাজার তো এই শুরু হল বলে, তাই এবার পুজোয় কী কিনবেন না কিনবেন, কী ধরনের পোশাক এখন চলছে, কোন শাড়ি চাই-ই চাই, তার কিছু টিপস রইল সুবিধার পাঠকের জন্য।

● এবার পালাজো প্যান্টস অর্থাৎ ঢোলা লম্বা, স্কার্ট -এর ঘেরওয়ালা ট্রাউজার ফ্যাশন-এর তুঙ্গে। সঙ্গে ছোট কুর্তি বা টি-শার্ট ভাল চলবে। আবার যাঁরা সাহসী ও ব্যতিক্রমী সাজ পছন্দ করেন, তাঁরা ছোট বুস্টিয়ার বা চোলির সঙ্গে কিংবা জ্যাকেট ব্লাউজ-এর সঙ্গে পালাজো পরে হাফ শাড়ি কেটে দোপাট্টার মতোও পরতে পারেন।

● পালাজোর সঙ্গে সঙ্গে একটা হারেম বা আলিবাবা প্যান্টও কিনতে পারেন। এর সঙ্গে হাতকাটা টি-শার্ট বা স্প্যাগেটি যেমন যায়, তেমনই চাইনিজ কলার দেওয়া গলা বন্ধ কুর্তি বা শর্ট জ্যাকেট মন্দ হবে না।
● হ্যারেম ট্রাউজার-এর সঙ্গে ছোট টপ ও সঙ্গে রঙিন স্কার্ফ দারুণ ফ্যাশনেবল।

● ছোটদের বা যাঁরা সুন্দর ফিগার-এর অধিকারি, তাঁরা টাইট বডি হাগিং টাইটস ও সঙ্গে শর্ট টপ অনায়াসে পরতে পারেন। যাঁদের ফিগার তেমন মানানসই নয়, তাঁরা টাইটস-এর সঙ্গে লম্বা কুর্তা যা কোমর ও নিতম্ব ঢেকে রাখে পরে নিন।

● লম্বা ঘের দেওয়া স্কার্ট, সঙ্গে লম্বা বা ছোট হাফ কুর্তি স্মার্টনেস এবং সৌন্দর্যের সমন্বয় সাধন করবে।
● এ বছর আবার লম্বা হাঁটু অবধি কুর্তা বা পাঞ্জাবির চল ফিরে এসেছে। চুড়িদার সহযোগ এই কুর্তার মার নেই।
● ফর্মাল ট্রাউজার, শার্ট ও জ্যাকেট একটা কিনে রাখতেই পারেন, নানা বৈষয়িক মিটিং-এর জন্য।

● শাড়ির বিকল্প নেই ভারতীয় নারীর ওয়ার্ডরোব-এ। আর পুজোয় তো শাড়ি না হলে নয়। এখন শাড়ির রকমফের অনেক, সেই সঙ্গে শাড়ি পরার বা আনুষঙ্গিকের কায়দা অনেক। এবার পুজোয় বোট নক বা জ্যাকেট ব্লাউজ বানিয়ে তার সঙ্গে তাঁতের শাড়ি কিংবা গিচা রঙিন শাড়ি পরলে মন্দ হবে না।

● লম্বা হাতা প্রিন্টেড ব্লাউজ সঙ্গে একরঙা সিল্ক বা শিফন চিরকালীন সাজ।

● ডিজাইনার ব্লাউজ বানাতে হলে এখনই অর্ডার দিন। অথবা এখনই কোনও দোকান থেকে রেডিমেড কিনে অল্টার করে তৈরি করে নিন পুজোর জন্য ব্লাউজ।

● জুতোর ক্ষেত্রে একটু আগে থেকে কিনে টেস্ট করে রাখা ভাল। এবার পুজোয় রঙিন ফ্ল্যাট নানা রঙের চটি ও জুতো কিনে শাড়ি ও জামার সঙ্গে মিলিয়ে পরতে পারেন। যেমন মুজরি বা নাগরা বা কোলাপুরি প্যাটার্ন, সেরকমই দেশি দু-রঙা চটিও দারুণ হবে।

● এই পুজোয় যাঁরা ট্রেন্ডি ও পশ্চিমী পোশাক পরতে ভালবাসেন তাঁরা একটি লম্বা বা শর্ট ককটেল ড্রেস সংগ্রহ করে রাখতেই পারেন। পুজোয় না পরলেও অন্য অকেশনে পরা যেতেই পারে।

● অন লাইন শপিং করলে, আগে ভাগে আনিয়ে বাড়িতে পরে পরীক্ষা করে নিন। নতুবা সমস্যা।

ডাহা পাগল

মিতা নাগ ভট্টাচার্য

এই রে ডাহা পাগলটা আসছে ... চল, চল সব ক্যানটিনে চলে যাই। ও একা একা ক্লাস করুক। আজ আমরা কেউ ক্লাস করব না।

কিন্তু স্যার আজ স্পেশাল নোট দেবেন বলেছিলেন যে, সবাই মিলে ক্লাস বয়কট করা ঠিক হবে না। কেউ একটা বলে ওঠে।

তুই ঠিক বেঠিক বিচার করতে থাক আমরা ততক্ষণে ক্যানটিনে চিকেন চাউমিন ঝেড়ে আসি। কথাটা ছুঁড়ে দেয় রোহিত। আর সময় ব্যয় না করে বড় বড় পা ফেলে ক্যানটিনের মুখে রওনা দেয়। ওর পিছনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকলেই প্রায় এগিয়ে যায়। ঝিমলি দেখছিল সব। বুঝতে পারছিল না কী করবে। কী করা উচিত? এভাবে ক্লাস ফাঁকি দিতে ওর ভাল লাগে না। কিন্তু কীই বা করবে? আর ডাহা পাগল যাকে বলা হচ্ছে, সে কতটা পাগল ঝিমলি জানে না, এটুকু অনুভব করে ডাহা পাগল মাঝে মধ্যে খুব স্পষ্ট কথা বলে ফেলে, তাতেই ওর উপাধি জুটেছে 'ডাহা পাগল'। ঝিমলি একটু পিছিয়ে পড়েছে দেখে ডাহা পাগল ওর সঙ্গে পা মেলাতে এগিয়ে আসে।

ওদের কান্ড দেখে হাসব না কাঁদব বুঝে পাই না। কোনও মানে আছে! বলে দে, স্যার আপনার পড়ানো আমাদের স্যাটিসফাই করছে না, পালাবার দরকার কী? পালালে চলবে? সিলেবাস শেষ করতে হবে। পরীক্ষা তো এসে যাচ্ছে। ঝিমলি চুপ করে ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়, এখান থেকে তাদের ক্লাসরুম দেখা যাচ্ছে। গুটি কয়েক ছেলে মেয়ে বসে আছে বটে সেখানে, স্যার যদি ওদের নিয়ে ক্লাস চালিয়ে যান! নাহ আর ভাবা যাচ্ছে না। যতদূর সম্ভব দ্রুততায় পা ফেলে ঝিমলির দলটাকে ধরে ফেলতেই হবে। ক্যানটিনের চা আজ বেশ ঠিকঠাক। কোনওদিন কড়া তেতো, কোনওদিন এত হালকা যে মুখে দেওয়া যায় না। ঝিমলি আর অনন্যা বসেছে এ ধারে। দু'চুমুক দিতে না দিতেই ওদিকে কিছু একটা গোলযোগ টের পায় ঝিমলি। হল কী! সব হুটপাট করে উঠে পড়ছে! স্যার নাকি ডেকে পাঠিয়েছেন। অমৃত বলে চোখা ছেলেটা হঠাৎ করেই চিৎকার করে ওঠে, তোরা যেতে হয় চলে যা, আমি পারছি না।

পায়ে চোট নিয়ে হাঁটতে পারছি না। অমৃত চোট পেল কখন? বন্ধুদের চোখের জিজ্ঞাসা অনুভব করে দৃঢ়তার সঙ্গে আবার বলে তার নাকি খুব ব্যথা পায়ে। সে একটুও চলতে পারছে না। ডাহা পাগল সব লক্ষ্য করছিল, বলেই ফেলল, 'মিথ্যুক কোথাকার, ফাঁকি দেওয়ার তাল কেবল।'

এম বি স্যারের বয়স কত আর? চাবুকের মতো কথা ছুঁড়ে দ্যান প্রত্যেক সময়। সে জন্য অনেকের পছন্দ নয়। ক্লাসে এক মিনিট দেরি হলেই বুঝিয়ে দেন এখন থেকেই যদি ক্লাসে লেট করে আসা শুরু করো সারা জীবন সব কাজে লেট হতেই থাকবে। ওটাই অভ্যাস হয়ে যাবে। স্যার বুঝি টের পেয়েছেন ছাত্ররা একটু অখুশি। প্রথমে একচোট নিলেন বটে তাদের কি ক্লাস রুটিন রপ্ত হয়নি? কোথায় ছিল সব। রোহিতের ঠোঁটের কোনায় শব্দ সাজানো বুঝি, অমৃতের পায়ে চোট লেগেছে সে নিয়েই তারা সকলে ইনভলভড ছিল। কতটা বিশ্বাসযোগ্য হল কথাটা বোঝা গেল না। কিন্তু স্যার আর কথা বাড়ালেন না। ফার্স্ট সেমিস্টার যেন জোয়ার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

সেকেন্ড সেমিস্টারও আসি আসি। এ অবস্থায় মাঝে মধ্যেই ক্লাস পালিয়ে শপিং মলে, পার্কে পদচারণা মেনে নিতে পারছে না হয়তো অনেকেই, তবুও সবুজের অভিযান বয়সটা এমনই...। ভেসে যেতে ইচ্ছে হয় কখনও সখনও।

সেদিন ফোর্থ পিরিয়ডের পর ডাহা পাগল পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিমলির। তার মনে হয়েছে ঝিমলি সিনসিয়ার। যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট। এস বি স্যার একটা ক্লাস টেস্ট নিতে চাইছেন কেমিস্ট্রির। তাতে সকলের সায় চাই। পিছিয়ে দেওয়ার জন্য তাল তুলেছে অনেকেই। ঝিমলি যেন বিষয়টাকে রুখে দেয়। একী বিপত্তি! ঝিমলির কথা সকলে মানবে কেন? শুনবেই বা কেন? কিন্তু দস্যি ছেলে, ডাহা পাগল ঝিমলির পিছন পিছন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে যায়।

শোন ঝিমলি কাল ভোট নেব, কজন পরীক্ষা পিছোতে চায় আর কজন পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলতে চায়। ঝিমলিকে কথা তুলতেই হয়। 'বেশিরভাগ পিছোতেই চাইবে। তুই কজনকে বোঝাবি? ওসব আমার দ্বারা হবে না। পরীক্ষাটা অনেকেই দিতে চাইছে না। এমনও জানিস কি?' ডাহা পাগলের চোখ এবার স্থির। পরীক্ষা দেবে না? মানেটা কী? তাহলে পড়তে এসেছে কেন? এরা কি মগের মুলুক পেয়েছে ? ঝিমলি মনে মনে প্রমাদ গোনে। ভাগ্যিস কেউ নেই কাছে ধারে। ডাহা পাগলের সঙ্গে কেউ খুব একটা মিশতে চায় না। তার সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে গপ্পো। এ নিয়ে হয়তো আবার কেউ কেউ গসিপ তৈরি করে ফেলবে। ঝিমলিকে রোজ বারুইপুর থেকে শ্যামবাজারের এই কলেজে আসতে হয়। দুরত্বের করণে ফেরার তাড়া থাকেই।

'এই আমার বাস আসছে, কাল কথা বলব।' ডাহা পাগলের মুখটা চুপসে যায়। ঝিমলি জানে ডাহা পাগল বা তাদের কজনের কথায় কেউ কান দেবে না। অমৃত ক্লাসের সেরা স্মার্ট ছেলে। তার কথন, চলন বলন সবার খুব পছন্দ। যখন তখন তার গলায় 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও...।' আর ক্লাস জুড়ে হাততালি। কোনও মেয়ের পাশে বসে সে ক্লাসটা সম্পূর্ণ করলে সে গদগদ। না ঝিমলি, রেহানা, ওরা অমনটা হতে পারছে না। এনি প্রবলেম অমনি অমৃত মুশকিল আসান। অমৃত ভাবনার স্রোতে ওরা গা ভাসায়নি। অমৃত নাকি মেডিকেল পেয়েও যায়নি। ও নাকি বেশ কিছুদিন

বিদেশে ছিল। কথায় কথায় ইংরাজি বুলি। নিত্য নতুন ড্রেসের বাহার। অথচ ক্যানটিনে ওর খাবারের দামটা কোনও না কোনও মেয়ের পার্স থেকে ব্যয়িত হয়। হাসি পায় ঝিমলির। এ হেন অমৃতের সঙ্গেই কথার টানা পোড়েন চলতে চলতে বিপুল তর্ক বেঁধে গেল। অমৃতের গলা উচ্চরবে সে নাকি দেখে নেবে হোমটেস্ট কারা দেয়। এ মুহূর্তে কোনও হোমটেস্ট নেওয়া চলবে না। অমৃতের দুই প্রিয় সখি জ্যাসমিন আর রঞ্জনা এক্কেবারে অমৃতের কথায় গলে পড়েছে। হোম টেস্ট দেওয়ার কোনও মানে নেই। সময় নষ্ট, একটা ক্লাস নষ্ট। তার চেয়ে থিয়োরি ডিসকাস করলে অনেক লাভ।

কারণ যাই হোক না কেন, এস বি স্যার নিজেই ডিক্লেয়ার করলেন পরীক্ষা নেবেন না। ওরা কেউ কেউ অবাক হল, কেউ নিস্পৃহ। লম্ফ ঝম্ফ বাড়ল একমাত্র অমৃতের। মুখ চুন, মেজাজ গরম ডাহা পাগলের। ম্যাথ ক্লাসে ম্যাডাম বেড়িয়ে যাওয়া মাত্রই ডাহা পাগল পাগলামো শুরু করেছে, সে ম্যাডামকে বলবে ক্লাস টেস্ট নিতে। পরীক্ষা না দিলে নিজের পড়ার গতি বোঝা যায় না। তারা তো হাই-ফাই ব্রিলিয়ান্ট নয়— পরীক্ষার চাপে তাও একটু পড়াশুনো হয়। কথাটা সকলেই মনে মনে বিশ্বাস করে। ঠিক তক্ষুনি অমৃত তেড়ে ফুঁড়ে উঠল।

নো পরীক্ষা, নিজের উপর কনফিডেন্স না থাকে তো অনার্স নিতে যাওয়া কেন? সায়েন্স নিয়ে পড়তে আসা কেন? ইঁদুর হয়ে হাতির গতি নিতে চাওয়া কেন? ডাহা পাগল এবার বন্য পাগল হয়ে যায় বুঝি।

অ্যাই অমৃত, মুখ সামলে কথা বল। কাকে ইঁদুর বলছিস রে? জানিস আমি হাতির শক্তি রাখি। এ কথায় হাসির তোড়ে ভাসে সকলে। বিদ্রূপের হাসি তো বটেই। ডাহা পাগল ওরা যাকে বলে তার আসল নাম যে সৌমিক সেকথা বোধহয় সকলেই ভুলতে বসেছে। পরের দুদিন তার নাম আবারও বদল হয় 'হাতি'।

ক্যানটিনে রেহানাদের দল সেদিন চাউমিনে পেট ভরাচ্ছিল, অন্যদিকে কেউ কেউ ফিশ চপ বা অন্য কিছু খাচ্ছে। অমৃত তো বসে খায় না, একবার এ দলের প্লেট থেকে তুলে নিল, আর একবার কোনও বান্ধবীর টিফিন বক্স থেকে লুচি-আলুরদম তুলে তার মায়ের হাতের রান্নার তারিফ। সদ্য নাম পাওয়া হাতিরও এ স্বভাব কিছুটা আছে বৈকি! কারুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তার দাবি তাকে না দিয়ে খাচ্ছে কোন সাহসে। বলেই চামচে করে তুলে নিল ম্যাগি স্যুপ। অমনি বন্ধুদের বিরক্তি। অমৃতের ব্যাপার হলে কারও বিরক্তি নেই। ফরেন থেকে ঘুরে এসেছে বলে কথা!

ডাহা পাগল নিজে চিকেন পকোড়া নিয়ে বসেছে, ওর গ্রুপের বন্ধুদের নিয়েই খাচ্ছে বটে তবুও অন্যদের কাছে গিয়ে ছোঁক ছোঁক করা স্বভাব। রেহানা তো আজ বিরক্তই হল।

অ্যাই, যাতো নিজের প্লেটের দিকে নজর দে। আমাদের আজ খুব খিদে। তোকে ভাগ দিতে পারছি না রে। কারা যেন ওদিক থেকে আওয়াজ দিল...।

হাতির অত বড় পেট ভরাতে হলে, অন্য প্লেটেও নজর তো দিতেই হবে। থমকে গেল ডাহা পাগল, হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যানটিন থেকে বেরিয়েই গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে হাসির দমক। জব্দ করা গেছে...। সেকেন্ড পিরিয়ডের পর আর ক্লাস চলছে না। সকলে মিলে সিনেমা হলে, ডাহা পাগল চটজলদি গড় গড় করে বলে দিচ্ছে কোন হলে কী সিনেমা। অথচ সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ও উল্টোপাল্টা বলছে। সে দিন কাছাকাছি পার্কেই বাকি সময়টা কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওরা। ক্লাসের সবচেয়ে সিনসিয়ার মেয়ে সমাদৃতার বাড়ি থেকে সেদিন হঠাৎ ফোন, ওর ভাইয়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সবার আগে পাশে এসে দাঁড়াল ডাহা পাগল।

চল চল আমি যাব তোর সঙ্গে। কোন হসপিটাল? খবরটা শুনে সমাদৃতা আতঙ্কিত। কদিন আগে ওর বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল! ফোনটা কানে লাগানো কিন্তু কোনও কথাই যেন শুনতে পারছে না সমাদৃতা। ওর ফোনটা চেয়ে নেয় সৌমিক ডাহা পাগল।

বলুন বলুন আমি সমাদৃতার ক্লাসমেট বলছি। রক্ত, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিন্তা করবেন না, আমরা রক্তের ব্যবস্থা করছি। এক্ষুনি আসছি। কোন হাসপাতাল...।

আরও কয়েকজন তৎপর হয়। ডুকরে কেঁদে উঠেছে সমাদৃতা অমৃতের এখনও দক্ষতার তুলনা নেই।

কুল ডাউন সমাদৃতা, প্রবলেমকে ঠাণ্ডা মাথায় ফেস করতে হবে...রে। কাঁদছিস কেন?

ডাহা পাগল, বন্ধুদের কাছে হাত পেতেছে তার পকেটে তেমন টাকা নেই। যার কাছে যতটুকু আছে সব নিয়ে তাড়াতাড়ি সমাদৃতাকে নিয়ে যেতে হবে। অমৃত একদম চুপ। তার কাছে দেবার মতো টাকা নেই। ততক্ষণে রওনা দিয়েছে ওরা কজনে। এই সমাদৃতাই সৌমিককে নাম দিয়েছে ডাহা পাগল। কারণ অবশ্য, ভর্তি হওয়ার দুদিনের মাথায়, চিৎকার করে গান গাইতে শুরু করে। যত থামতে বলে থামে না। রেগে গিয়ে সমাদৃতা বলে ফেলেছিল 'ডাহা পাগল'। সেই নামটাই রয়ে গেল, কারণ নিত্য নতুন ওর পাগলামো লেগেই আছে। এই মুহূর্তে সৌমিক শান্ত স্থির। সমাদৃতাকে থামিয়েছে। শান্ত করেছে। একদম ভাবিস না। আমরা সকলে আছি তোর সঙ্গে। একদম দেরি নয়, চল চল।

ঝিমলির যাওয়ার উপায় নেই। তাকে ফিরতে হবে অনেকটা পথ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঝিমলি রেহানা রোহিত একটু চুপচাপ বসে থাকল। ওদিকে অমৃতের জোর গলায় গান আর হাসির শব্দ ক্রমে উঠছে উচ্চতানে। ফোন বেজে উঠল রোহিতের। সৌমিকের ফোন...।

বি পজিটিভ ব্লাড দরকার, আমাদের মধ্যে কেউ যদি... কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার করে রোহিত জানান দিয়ে দেয়। অমৃত মিনমিন স্বরে কী যেন বলছে। দু'তিনজন এগিয়ে এসেছে। রেহিত সব শুনে নিচ্ছে, ওরাও যাবে।

পরদিন কলেজে ঢুকতেই সকলের মুখে এক কথা—। সৌমিক না থাকলে কালকে যে কী হত! কী অসম্ভব তৎপরতায় ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলা, ডাহা পাগল নিজে রক্ত দিয়েছে। সমাদৃতার মা তো একা। বাড়িতে ওর বাবাও তো অসুস্থ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা। সমাদৃতার ভাই যে বেঁচে আছে, মাথায় চোট, রক্ত জমেছে। অবস্থা একটু ভাল হলেই মাথার জমাট রক্ত বের করে দিতে হবে। হাত-পায়ের চোটও সাংঘাতিক।

হঠাৎ করেই কী যেন মনে পড়ে যাচ্ছে ঝিমলির... এই তো সেদিন, কী একটা ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে ব্লাড গ্রুপ লিখতে হচ্ছিল। ওর পাশেই ছিল অমৃত। মুখে উচ্চারণ করেই তো লিখছিল। বি পজিটিভ সেই মুহূর্তে ঝিমলির ডান পাশ থেকে শব্দরা ছুটে আসছিল...। আরে রোহিত একমাত্র বি পজিটিভ, অমৃত তো রক্ত দিতেই পারল না, ওর ব্লাড গ্রুপ ফেভার করল না। চমকে তাকাল ঝিমলি। বোবা নিঃস্পন্দ। অমৃত একটু দুরেই দাঁড়িয়ে আছে, সেই অনবদ্য স্মার্টনেসকে দৃঢ়তায় রেখে।

ডাহা পাগল ফোনে বকে চলেছে সমাদৃতার উদ্দেশ্যে... কোনও চিন্তা করিস না। তোর সব নোট আমি জেরক্স করে ফেলেছি। আজ তো যাচ্ছিই তোর কাছে...।

ওদিকে অমৃত দুই গার্লফ্রেন্ড জ্যাসমিন আর রঞ্জনাকে সঙ্গে করে জোর কদমে পা চালাচ্ছিল মাল্টিপ্লেক্স-এর দিকে।

নারীর সুরক্ষায়

রাজ্যে এই মুহূর্তে মহিলারা কতটা নিরাপদ? রাস্তা ঘাটে নারী নিগ্রহের ঘটনা কি আগের থেকে বাড়ছে? পার্কস্ট্রিট ও কামদুনীর ঘটনা কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? এসব পরিসংখ্যান নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক চলবে। কিন্তু একথা সত্যি রাস্তা-ঘাটে, কর্মক্ষেত্রে, এমনকী বাড়িতে মেয়েদের কুৎসা ও হেনস্থার শিকার হতে হয়। এক্ষেত্রে মেয়েদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, কোথায় অভিযোগ করতে হবে জানিয়েছেন আইনি বিশেষজ্ঞরা। কথা বলেছেন **সৈকত হালদার**

ইভজিটিং : আইনের চোখে রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের অশালীন ইঙ্গিত ও কটুক্তি করা। ইভটিজিংয়ের পরিধি অনেক ব্যাপক। এই তালিকায় রয়েছে :

- রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের জ্বালাতন বা বিরক্ত করা
- টোন কাটা
- অশালীন গালাগালি করা
- অশ্লীল বা কুৎসিত ইঙ্গিত করা
- অশ্লীল sms করা
- যে কোনও আপত্তিকর মৌখিক, অমৌখিক বা শারীরিক যৌন আচরণ করা
- জোর করে শরীর স্পর্শ করার চেষ্টা

ইভটিজিং-এর শিকার হলে : ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে হবে এবং এরপর স্থানীয় থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অবশ্যই সাক্ষী থাকা দরকার।

স্থানীয় থানা অভিযোগ না নিলে : স্থানীয় থানা অভিযোগ নিতে অস্বীকার করলে লালবাজারের প্রথম তলায় উইমেন গ্রিভান্স সেল-এ সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারেন। এই সেল খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে।

বিচার ও শাস্তি : কেস অনুযায়ী ইভটিজিং-এর বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। বিষয়টি ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত। ইভটিজিং, খুন বা ধর্ষণের মতো অপরাধ নয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে আসে। তাই এটি জামিনযোগ্য অপরাধ। সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত সাজা হয়। বর্মা কমিশন শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে।

মোলেস্টেশন : যৌন হেনস্থার একটি ভাগ হল মোলেস্টেশন। কোনও মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করায় জোর করাকে মোলেস্টেশন বলা হয়। এই মোলেস্টেশন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

- কোনও মহিলাকে কোনও ব্যক্তিগত মুহূর্তে লুকিয়ে দেখা
- রাস্তায় অনুসরণ করা
- রাস্তাঘাটে হাত ধরে টানা
- পথ আটকানো
- ফোন করে বারবার বিরক্ত করা
- পর্নোগ্রাফি দেখানো
- কোনও মহিলার নগ্ন ছবি তোলা

শিকার হলে : মোলেস্টেশনের কোনও ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানাতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোনও কাজ না হলে সরাসরি লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

বিচার ও শাস্তি : এটিও ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪ ধারার অন্তর্ভুক্ত। কেস অনুসারে ১ বছর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত সাজা হয়। এক্ষেত্রেও বর্মা কমিশন শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা : অফিস-আদালত ইত্যাদি যে কোনও কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের কম বেশি যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা বলতে বোঝায় :

- কোনও সহকর্মিনীর গায়ে হাত দেওয়া বা হাত দেওয়ার চেষ্টা করা
- কোনও সহকর্মিনীর উদ্দেশে যৌন রসাত্মক মন্তব্য করা
- যৌন রসিকতা করা
- অশ্লীল ছবি বা সিডি দেখানো
- অশ্লীল বই দেখানো
- গোপন অঙ্গ দেখানো
- অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা

শিকার হলে : এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সাক্ষী রাখুন। তারপর যা করবেন :

- সহকর্মীকে সতর্ক করতে হবে
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান
- স্থানীয় থানায় ওই সহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করুন
- থানায় ডাইরি করার পর সংশ্লিষ্ট রসিদটি হাতে রাখবেন
- পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না নিলে পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন

বিচার ও শাস্তি : কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার ২টি ভাগ, কর্পোরেট এবং নন-কর্পোরেট ক্ষেত্র। কর্পোরেট ক্ষেত্র বলতে বোঝায় অফিস বা সংস্থায় সহকর্মী বা বসের হাতে যৌন হেনস্থা আর নন কর্পোরেট ক্ষেত্র বলতে বাড়ির পরিচারিকাকে যৌন হেনস্থা করা। কেস অনুসারে ২ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা হতে পারে।

পারিবারিক সুরক্ষা আইন : ভারত সরকার মেয়েদের সুরক্ষার জন্য এই বিশেষ আইন 'পারিবারিক সুরক্ষা আইন' ২০০৫ সালে প্রণয়ন করেন।

কারা সুরক্ষা পাবেন : এই আইনে শুধুমাত্র গৃহবধূরা নন, রক্তের সম্পর্কে, বিয়ের সূত্রে, দত্তকের সূত্রে আবদ্ধ, এমনকী কোনও সম্পর্কে আবদ্ধ নন, শুধুমাত্র লিভ টুগেদার করা সঙ্গিনীরাও সুরক্ষা পাবেন।

কী কী অপরাধ বলে গণ্য হয় : এই আইন অনুসারে যৌথ পরিবারের সদস্যরা গৃহবধূকে নির্যাতন করলে তা যেমন দন্ডনীয় তেমনই বাপের বাড়িতে থাকা মা-ঠাকুমা-পিসি-মাসি-সৎমা নিগ্রহ করলে সেটাও দন্ডনীয় অপরাধ। মারধর এবং আঘাত, স্ত্রীকে শারীরিক সম্পর্কে বাধ্য করা, বিয়েতে বাধ্য করা। আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে কোনও কাজে বাধ্য করা, বউকে যথেষ্ট পণ আনেননি কেন বলা কিংবা কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য গঞ্জনা দেওয়া—এসবই শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, আবেগগত নির্যাতন হিসেবে গণ্য হবে। ভরণ পোষণের টাকা না দেওয়া, ভাড়া বাড়িতে থাকলে বাড়ি ভাড়ার টাকা না দেওয়া, কাজ করতে না দেওয়া, খাবার দাবার জামাকাপড়, ওষুধপত্র না দেওয়া কিংবা বাড়িতে থাকলেও সে সব ব্যবহার করতে না দেওয়া—এসবই ধরা হয় আর্থিক নির্যাতন হিসাবে। এমনকী শিশুদের ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন ও পড়াশুনো ছাড়তে বাধ্য করা পারিবারিক নির্যাতন বলে গণ্য হয়। যেসব আর্থিক সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা আদালতের রায় অনুসারে স্ত্রীর প্রাপ্য, তার থেকে বঞ্চিত করা অর্থনৈতিক অত্যাচারের মধ্যে পড়ে।

সুরাহা পেতে : এইসব অত্যাচারের প্রতিকার পেতে কোনও মামলা করার দরকার নেই। এখন প্রতিটি এলাকার জন্য পৃথকভাবে একজন প্রোটেকশন আধিকারিক, বিশেষ সুরক্ষা আধিকারিক হিসাবে থাকেন। অভিযোগকারিনী যদি পুলিশের কাছে বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা প্রোটেকশন অফিসারের কাছে অভিযোগ জানান, তাহলে তাঁরা এইসব অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

যখন ধর্ষণ : দৈনিক সংবাদপত্র খুললে কিংবা টিভি চ্যানেলের রোজকার খবর 'রেপ', ধর্ষণ! আইনের চোখে ধর্ষণ বলতে বোঝায় কোনও মহিলার সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সহবাস করা। যৌন হেনস্থার সর্বাত্মক রূপ 'রেপ'। এই রেপের নানা প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন, নাবালিকাকে ধর্ষণ গর্ভবতী মহিলাকে ধর্ষণ, পুলিশের হেপাজতে থাকা মহিলার ধর্ষণ, বা কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক দ্বারা অধীনস্থ কর্মচারীর ধর্ষণ, 'বিবাহিত জীবনে' জোর করে ধর্ষণ। সেজন্য একটি মাপকাঠি দিয়ে সব ধরনের ধর্ষণকাণ্ডকে বিচার করা যায় না।

রেপের ঘটনা ঘটলে : ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ দায়ের

করতে হবে। দুভাবে অভিযোগ নেওয়া হয়, জিডি এবং এফআইআর। জিডি অর্থাৎ জেনারেল ডাইরি হল পুলিশের লগবুক-এ লেখা থানায় যে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়, তা জিডিতে তুলে রাখা হয়। অ-ধর্তব্য কিন্তু ধর্তব্য অপরাধের বেলায় জিডি নয়, এফ আই আর করতে হয়। এই এফআইআরের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার, তদন্ত, চার্জশিট-এর নির্দেশ দেয়।

● অভিযোগ নিজের হাতে লেখা উচিত। থানায় যাওয়ার আগে পুরো ঘটনাটি নিজে লিখে বা বিশ্বাসযোগ্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ অফিসার অভিযোগ লিখলে সেটা লেখার পর শুনে নেবেন।

● পুলিশকে কী কী জানাবেন : অভিযোগকারিনীর বয়স, কবে, কখন, কোথায় ঘটেছে, অপরাধী ক-জন।

অভিযোগকারিনী যা করবেন :

● খুব দ্রুত থানায় অভিযোগ জানাতে হবে, না হলে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ মুছে যেতে পারে

● নিজে থেকে সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়ে আসতে পারেন

● পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানান

● পোশাক কাচবেন না। পুলিশি তদন্তে সেটি কাজে লাগে

● অভিযোগের আগে সাবান দিয়ে ঘষে স্নান করবেন না। এতে শারীরিক অত্যাচারের চিহ্ন মুছে যেতে পারে

স্থানীয় পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করলে : ধর্ষণের নয়া বিধি ও গণ মাধ্যমের চাপে পুলিশ এখন ধর্ষণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সক্রিয়। যদি চাপে পড়ে বা অন্য কারণে স্থানীয় থানা জি ডি এবং এফআইআর নিতে অস্বীকার করে সরাসরি লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। ফোন করতে পারেন এই নম্বরে। ২২১৪-৫০৪৯/২৪৫০-৬১১৪ অথবা মেল করুন, www.kalkatapolice.gov.in / www.bidhannagarcitypolice.com / www.howrahcitypolice.com

শাস্তির বিধান : কেসের অবস্থা ও গুরুত্ব বিচার করে শাস্তি হয়। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬ ধারা অনুযায়ী যে কোনও ধর্ষণকারী অন্তত ৭ বছর বা ১০ বছর কিংবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে। তার সঙ্গে জরিমানা হতে পারে যদি ধর্ষিতা স্ত্রী না হন। অন্যথায় ২ বছর কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে। ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব পাবলিক প্রসিকিউটরের উপর।

আইনি উপদেষ্টা : দীপা তলাপাত্র, লোক আদালতের সদস্য সিটি সিভিল কোর্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ আইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিশেষজ্ঞ

যৌন হেনস্থার আইনি বিধান একনজরে

ইভটিজিং, মোলেস্টেশন, নারী নিগ্রহ, শ্লীলতাহানি এসবই হল যৌন হেনস্থা বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের এক একটি রূপ। যৌন হেনস্থার যাবতীয় আইন কানুন ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪ ধারার অন্তর্গত। এই আইনের আবার একাধিক ধারা উপধারা রয়েছে। অতশত জটিল আইনি মারপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন ঘটনায় কী হয়

■ কারও সঙ্গে তার অসম্মতিতে শারীরিক সম্পর্ক করলে ৫ বছরের জেল বা জরিমানা বা দুটোই

■ কারও কাছ থেকে কোনও যৌন সংক্রান্ত সুবিধার চাহিদা বা অনুরোধ করা : ৫ বছরের জেল বা জরিমানা বা দুটোই

■ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও যৌনগন্ধি গালাগালি দিলে : ১ বছরের জেল বা জরিমানা বা দুটোই হতে পারে

■ কোনও অনিচ্ছুক মহিলাকে বলপূর্বক পর্নোগ্রাফি দেখতে বাধ্য করে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া। ১ বছরের জেল বা জরিমানা বা দুটিই হতে পারে

■ কোনও মহিলার একান্ত ব্যক্তিগত কোনও কাজ লুকিয়ে দেখা, ছবি তোলা বা তৃতীয় ব্যক্তিকে সেই ছবি দেখানো : এই অপরাধ প্রথমবার করলে শাস্তি ন্যূনতম ১ বছরের জেল ও সর্বোচ্চ ৩ বছরের জেল আর জরিমানা

এই অপরাধ দ্বিতীয়বার করলে ন্যূনতম ৩ বছর ও সর্বোচ্চ ৭ বছর জেল।

প্রথমবার জামিনযোগ্য হলেও দ্বিতীয়বার তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তা জামিন অযোগ্য।

■ কোনও মহিলার প্রতি অশালীন আচরণ, যৌনতা সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহার বা অঙ্গ ভঙ্গি করে অপমান করার চেষ্টাও সর্বাধিক ১ বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা বা দুটোই

■ কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আটকে রাখা : অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্চ ১ মাস পর্যন্ত জেল বা ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা দুটিই হতে পারে।

■ ইন্টারনেট, ই মেল বা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে কাউকে বিরক্ত করা, অশ্লীলতা ছড়ানো, অশ্লীল sms পাঠিয়ে উত্যক্ত করা, এক্ষেত্রে ৩৫৪ ডি উপধারা অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করা যায়। এই অপরাধ জামিন অযোগ্য এবং শাস্তি ন্যূনতম ১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩ বছর জেল, সঙ্গে জরিমানা।

■ কিছু গুরুত্বপূর্ণ হেল্প লাইন

অ্যান্টিহিউম্যান ট্র্যাফিকিং ০৩৩২৪৫০৬০০৪

উওম্যান হেল্পলাইন : ০৩৩২২৫০৫৩৪০

অ্যান্টি স্টকিং হেল্পলাইন : ৮০১৭১০০১০০

শিশুর ব্যবহারিক সমস্যা হলে

আপনার সন্তান দুষ্টুমি করবে, এটা, ওটা নেওয়ার জন্য বায়না করবে, না পেলে রেগে যাবে, এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। শিশুর একটু আধটু দুষ্টুমি সবারই পছন্দের কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত এ সব হাসিমুখে মেনে নেবেন? এর সঙ্গে যদি থাকে মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, বন্ধুবান্ধবদের অকারণে মারধর করার মতো স্বভাব! শিশুর এই সমস্ত আচরণকে শিশুসুলভ বলে হেসে ওড়াবেন না। পরবর্তীকালে এই সমস্যাগুলো অনেক বড় আকারে দেখা দিতে পারে। শিশুর আচরণগত নানারকম সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় জানালেন কনসালটেন্ট সাইকিয়াস্ট্রিস্ট **ডাঃ দেবাঞ্জন পান**

প্রশ্ন : শিশুর দুরন্তপনা, দুষ্টুমি কি অসুখ?

উত্তর : শিশু তার স্বাভাবিক নিয়মেই দুষ্টুমি করবে, দুরন্ত হবে। কিন্তু এই দুরন্তপনা মাত্রা ছাড়ালেই সমস্যার। যে দুরন্তপনার জন্য বাচ্চার পড়াশেনার ক্ষতি হয়, তাকে অস্বাভাবিক বলেই ধরা হয়। এই সমস্যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয়, অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিজঅর্ডার সংক্ষেপে এডিএইচডি।

প্রশ্ন : কী কী লক্ষণ থাকে এই সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের?

উত্তর : এডিএইচডি-র শিশুরা কখনওই কোনও জায়গায় শান্ত হয়ে বসে না। স্কুলের পড়াশোনার জিনিসপত্র ঠিকমতো গুছিয়ে বাড়িতে ফেরত আনে না। কোনও প্রশ্ন ঠিকমতো শোনে না। অর্ধেক কথা শুনেই তার উত্তর দিতে শুরু করে। হঠাৎ করে রেগে যায়, জিনিসপত্র ভাঙচুড় করে, চিৎকার করে, বাড়ির পোষ্য প্রাণীদের উত্যক্ত করে।

শিশুর এডিএইচডি সমস্যা আছে কিনা বোঝার সবচেয়ে ভাল উপায় হল কোনও স্ট্রাকচারাল সেটিং অর্থাৎ কোনও জায়গায় গিয়ে কেমন ব্যবহার করে সেটা দেখা। যেমন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে তার আচরণ লক্ষ্য করা। যদি সেখানেও একইরকম দুষ্টুমি করে, এটা ওটায় হাত দেয় তখন বুঝতে হবে শিশুর সমস্যা আছে। অন্য সাধারণ দুষ্টু বাচ্চারা কিন্তু এসব জায়গায় শান্ত হয়েই বসে থাকে।

প্রশ্ন : এডিএইচডি-র কারণ কী?

উত্তর : এর মূল কারণ বায়োকেমিক্যাল ইমব্যালান্স। ব্রেনের মধ্যে নিউরোট্রান্সমিটার-এর তারতম্যের জন্য এমন হয়। এই শারীরিক সমস্যাগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে শিশুর পারিবারিক অস্থির পরিবেশ, নিয়মানুবর্তিতার অভাব। আবার বাবা, মা-র মধ্যে অশান্তি, তাঁদের বনিবনার অভাবও অনেক সময় শিশুর এই অস্থিরতাকে ইন্ধন জোগায়। কাজেই শিশুর এ ধরনের সমস্যার জন্য তার শারীরবৃত্তিয় কারণ যেমন দায়ী, তেমনই কিছুটা হলেও দায়ী তার পরিবারও।

প্রশ্ন : এডিএইচডি-র চিকিৎসা কী?

উত্তর : ওষুধ এবং কাউন্সেলিং—এ রোগের চিকিৎসায় দুটো পদ্ধতিরই প্রয়োজন হয়। যেহেতু নিউরোট্রান্সমিটার-এর তারতম্যের জন্য এই সমস্যা দেখা দেয় তাই ওষুধ দিতেই হয়। দুধরনের ওষুধ সাধারণত ব্যবহার হয় এই রোগের চিকিৎসায়। যেমন স্টিমউলেটিং এবং নন স্টিমিউল্যান্ট ড্রাগস। দুটোরই কিছু প্লাস, কিছু মাইনাস পয়েন্ট আছে। তাই কাকে কোন ওষুধ কতটা দিতে হবে তা অভিজ্ঞ চিকিৎসকই ঠিক করতে পারেন। এছাড়া শিশুর বিহেভিয়ারাল থেরাপিরও প্রয়োজন হয়। শিশুর আচরণগত পরিবর্তনের জন্য কিছু কিছু টাস্ক তাকে দেওয়া হয়। সেগুলো প্র্যাক্টিস করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। শিশুর সঙ্গে বাবা, মায়েরও কাউন্সেলিং করা দরকার। তাঁদেরও কিছু কিছু এমন নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে পারিবারিক পরিবেশের উন্নতি ঘটে এবং তা বাচ্চাকে শান্ত হতে সাহায্য করে। প্রয়োজনে পরিবারের রুটিনেও কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে। কারণ পরিবারে অরগানাইজড ভাব কম থাকলে শিশুর এই দুষ্টুমি আরও বেড়ে যায়।

প্রশ্ন : এডিএইচডি-র বাচ্চারা কি পড়াশোনায় ভাল ফল করতে পারে?

উত্তর : সাধারণত তা পারে না। কারণ শিশু তো মন শান্ত করে কোনওকিছু শুনতে চায় না। শিখতে চায় না কোথাও শান্ত হয়ে দুদণ্ড বসে না। শিক্ষকদের পড়া ঠিকমতো শোনে না। অস্থিরতার জন্য শেখা জিনিসও ভুলে যায়। কাজেই পড়াশোনায়ও তারা পিছিয়ে যেতে থাকে।

প্রশ্ন : শিশু মাঝে মধ্যে বন্ধুদের ইরেজার, পেন কিংবা পেনসিল যে চুরি করে আনে, এটাও কি অসুখ?

উত্তর : শিশুদের এই আচরণকে প্রথমেই গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। কারণ বেশিরভাগ সময়েই শিশু নিছক কৌতূহল বশে অন্যের জিনিসের প্রতি তাৎক্ষণিক ভাল লাগা থেকে চুরি করে। যদি বাবা, মা প্রথম থেকেই বাচ্চাকে বোঝায়, চুরি করা ঠিক নয়, অন্যের জিনিস না বলে নেওয়া উচিত নয়, বন্ধুরা তাকে ভাল চোখে দেখবে না। টিচারদের কাছেও তার ভাবমূর্তি খারাপ হয়ে যাবে তাহলে দেখা গিয়েছে এই চুরি করার প্রবণতা কেটে যায়।

কিন্তু যদি দেখা যায় পেরেন্টাল গাইডেন্স অর্থাৎ বাবা, মা-র বোঝানো সত্ত্বেও কাজ হচ্ছে না। শিশুর চুরির অভ্যাস থেকেই যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর এই চুরি করার বিষয়ে কোনও অনুতাপ থাকে না, বরং তাতে একটা আনন্দ খুঁজে পায় সে এবং চুরি করার ঘটনা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এরকম সমস্যা কিন্তু স্বাভাবিক নয়। একে বলা হয়, অপোজিশনাল ডিফারেন্ট ডিজঅর্ডার বা সংক্ষেপে ও ডি ডি। এক্ষেত্রে শিশু কোনও

কিছুকেই গুরুত্ব দিতে চায় না। এর সঙ্গে আরও কিছু সমস্যা শিশুর দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন : ও ডি ডি-র সঙ্গে চুরি করা ছাড়া আর কী সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : শিশুকে যা করতে বলা হবে তার বিপরীতটা করা, কথায় কথায় মিথ্যে কথা বলা, কারণে অকারণে অন্যদের উত্যক্ত করা, যাকে তাকে মারধর করা, নিজের ভুলের দায় অন্যের ওপর চাপানো, একটুতেই রেগে যাওয়া, প্রচন্ড জেদ, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করা ইত্যাদি। কাজেই শিশুর মধ্যে এ ধরনের আচরণের প্রবণতা একটু করে বাড়তে দেখলেই মনোবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার। নয়তো এই সমস্যা বেড়ে গেলে আরও বড় বিপদ দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন : বড় বিপদ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : শিশুর চুরি করা, মিথ্যে বলা, ঝগড়া করা এই সমস্যাগুলো তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। তখন শুধু রোগ নয়, রাগের সঙ্গে থাকে ভাঙচুর করা, আগুন ধরানো, বাড়ির পোষ্যদের উপর বেশি মাত্রায় শারীরিক অত্যাচার করা ইত্যাদি লক্ষণ। ডাক্তারি শাস্ত্রে এই সমস্যাকে বলা হয় কনডাক্ট ডিজঅর্ডার।

প্রশ্ন : শিশুর আচরণগত এই সমস্ত সমস্যা দূর করার উপায় কী?

উত্তর : প্রথমেই বলি, রোগ নির্ণয় করে যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করা যায় ততই শিশু এবং পরিবারের পক্ষে মঙ্গলের। চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি প্রথমে জেনে নেন, বাবা-মার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক কেমন, তাঁদের দুজনের অশান্তি, বনিবনার অভাব শিশুর মনে কোনওভাবে প্রভাব ফেলছে কিনা, তাঁরা শিশুকে ঠিকমতো সময় দিচ্ছেন কিনা ইত্যাদি। যদি দেখা যায় এদিকে কোনও সমস্যা আছে তখন তা পরিবর্তন করে শিশুর সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। অনেক সময় এতেই কাজ হয়। কিন্তু যদি দেখা যায়, পারিবারিক কোনও সমস্যা নেই, তা সত্ত্বেও শিশুর অবাধ্য আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না তখন সাইকোলজিকাল টেস্টের মাধ্যমে স্কোর নির্ণয় করা হয়। এতে শিশুর সমস্যা কতটা গভীর জেনে চিকিৎসা করা হয়। প্রথমেই বিহেভিয়ারাল থেরাপি দিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়। বাবা-মাকেও কিছু গাইডলাইন দেওয়া হয়। আর বাড়াবাড়ি হলে কিছু ওষুধ দিতে হয়। এই চিকিৎসা যদি ছোটবেলাতেই না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে বড় আকারে তা দেখা দিতে পারে। তখন অনেকক্ষেত্রেই আর তাদের মূল স্রোতে ফেরানো সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন : শিশুর আচরণ ঠিক রাখার জন্য বাবা-মা-র কী করণীয়?

উত্তর : প্রথম থেকেই শিশুকে খুব বেশি আদর কিংবা শাসন না করা। দুটোর মধ্যে যেন সমন্বয় থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে। শিশু যা চাইছে তা-ই দেওয়া, সে যা বলছে তা-ই দেওয়া, সে যা বলছে তা-ই মেনে নেওয়ার প্রবণতা যেমন খারাপ তেমনই শিশুর সব কথা অবিশ্বাস করা, শাস্তি দেওয়া এসবও খারাপ। শিশু মিথ্যে বলছে বুঝতে পারলে প্রথম থেকেই তাকে ভালভাবে বোঝান যে এই কাজ ঠিক নয়। একই সঙ্গে শাসন ও ভালবাসা যেন থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিশুর সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটাতে হবে। কিছু মূল্যবোধের শিক্ষাও শিশুকে দেওয়া দরকার। সেই মূল্যবোধ যেন নিজেদের ব্যবহারেও প্রকাশ পায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বাচ্চাকে বলছি মিথ্যে বলো না, আর নিজে মিথ্যের পর মিথ্যে বলে যাচ্ছি—এটা যেন না হয়। আর কিছু নান্দনিক শিক্ষার মধ্যে শিশুকে রাখা দরকার। গান, নাচ, আঁকা, আবৃত্তি, খেলা, বই পড়া এসবে অভ্যাস গড়ে তুললে শিশুর সমস্যা অনেক কম হয়।

কাশ্মীরে কয়েকদিন

শ্রীজিৎ রায়, বাংলা টেলিভিশন ধারাবাহিকের ব্যস্ত পরিচালক। কিন্তু বছরে একবার বেড়াতে যাওয়া চাই। গত পুজোয় গিয়েছিলেন কাশ্মীর। তারই কিছু ঝলক সবার জন্য।

এই সবে বিছানা থেকে উঠলাম। গত তিনদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলাম। এ এক অদ্ভুত জ্বর, ছোটবেলায় শুনতাম জ্বর এলে খুব কাঁপুনি হয়, গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে শুতে হয়, স্নান করতে নেই, ভাত খেতে নেই আর এ ভাইরাল জ্বর হয়ই নাকি গরম থেকে। ফলে এর ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টো। জ্বর এলে গরম লাগে, ডাক্তার বলছেন, সারাক্ষণ প্রায় জলের তলায় দাঁড়িয়ে থাকলেই ভাল। আসলে এই বার কোলকাতা শহরের গরম বোধ হয় চেন্নাইকেও ছাড়িয়ে গেছে। গরমে যেন কোনও কিছুতেই স্বস্তি নেই। শুধুমাত্র ঘরের বাতানুকুল যন্ত্রটি ছাড়া। তবে গতবছর ২০১৩-তে এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে পুজোর সময় পালিয়ে গিয়েছিলাম কাশ্মীর। আহাহা এই কাশ্মীর শব্দটার মধ্যেই যেন রয়েছে এক আরামদায়ক ঠাণ্ডা শীতল অনুভূতি। যদি ঘ্রাণেনং অর্ধ ভোজনং হয়, তাহলে এটাও বলা যায় কিছু এমন স্মৃতি থাকে মানুষের জীবনে, যার অনুভূতি বাস্তব জীবনকেও প্রভাবিত করে।

গত বছর পুজোতে বেড়িয়ে পড়েছিলাম কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে। আমরা বেরিয়ে ছিলাম ১১ অক্টোবর ২০১৩। একদিকে পুজোর ঢাক বাজছে, কলাবউ স্নান সেরে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে যাচ্ছে আর আমরা তখন ট্যাক্সিতে লাগেজ বোঝাই করছি, প্রায় ১২ দিনের জন্য বেরোনো, লাগেজ নেহাৎ কম নয়। কিন্তু কাশ্মীর যাওয়ার আনন্দে কখন যে আমি কুলিতে পরিণত হয়ে গেছি বুঝতেও পারিনি। এবার ট্যাক্সি ছুটল কুঁদঘাট থেকে স্টেশনের উদ্দেশে।

কলকাতা স্টেশন পৌঁছে গেলাম ১১টার মধ্যে। আমি আবার একটু হাতে সময় রেখে স্টেশন পৌঁছে যাওয়ার পক্ষে। গিয়ে মিনারেল ওয়াটারের কয়েক বোতল, কিছু ড্রাই ফুড, বিস্কুট, আলুভাজা, চানাচুর, কিনতে কিনতেই শুনলাম সেই চরম ঘোষণা '1315up জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে।' অমনি সব মালপত্র নিয়ে আমরা চলে গেলাম। Ac 3 Tier Coach- এর সামনে। দরজা খুলতেই মালপত্র নিয়ে যে যার সিট-এর কাছে পৌঁছে জিনিসপত্র গুছিয়ে বসা। মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুনি একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর হলে নাটক শুরু হবে। প্রথম বেল, দ্বিতীয় বেল বেজে গেছে, অপেক্ষা শুধু তৃতীয় বেল-এর আর পর্দা খোলার। সমস্ত টেনশন, এতদিনের রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সেই চরম স্বপ্নের দিকে ঠেলে পৌঁছে দিল থার্ড বেল— পড়ল ট্রেনের হুইসল। সঙ্গে সঙ্গে সবকটা ইন্দ্রিয় সতেজ হয়ে উঠল, ট্রেন ছাড়ল।

হঠাৎ দেখলাম ট্রেনে আমার সহযাত্রীরা একসঙ্গে সবাই কপালে হাত ছোঁয়াল। কেউ কেউ বলে উঠল, 'জয় মা' বুঝলাম দক্ষিণেশ্বর পেরিয়ে গেল জম্মু তাওয়াই। সমস্ত ঢাকের আওয়াজ, বিভিন্ন প্যান্ডেলের প্রতিমার মুখ ফেলে আমরা ঝাড়খন্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা পেরিয়ে আড়াই দিন বাদে সকাল ৮.৩০ মিনিটে পৌঁছলাম স্বপ্নপুরীর দোড়গোড়ায়, জম্মু স্টেশনে। দিনটা পুজো অনুযায়ী ছিল নবমী।

জম্মু থেকে রিজার্ভ করা বাসে উঠলাম। জম্মু এবং কাশ্মীরের পাহাড়ি রাস্তা খুব চওড়া ও ভাল। কিন্তু বিভিন্ন ট্রাক ও প্রতিরক্ষা

বাহিনীর চলাচলের কারণে রাস্তায় খুবই যানজট হয়। ফলে ওখানকার ট্যুরিস্ট বাসই সবচেয়ে বেশি আরামদায়.ক। ছোট প্রাইভেট গাড়িগুলোকে আর্মির লোকজন বড় বেশি চেক করে। সে তুলনায় বাস-এর চেকিং কম হয়।

জম্মু থেকে বাসে প্রথম গন্তব্যস্থল হল পাটনিটপ। জায়গাটি জম্মু স্টেশন থেকে ১১০ কিমি দূরে। পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা। বাসে মালপত্র গুছিয়ে যখন জম্মু থেকে বাস ছাড়ল তখন বাজে প্রায় সকাল ১১টা। স্টেশনেই আমরা ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি। লাঞ্চ করব রাস্তায়। সেই অনুযায়ী সাড়ে বারোটার সময়ে বাস দাঁড়াল এক পাঞ্জাবি ধাবায়। ঠিক করলাম আজ পাঞ্জাবি ধাবায় শুদ্ধ পাঞ্জাবি খাবার খাব। আমি অসম্ভব খাদ্য রসিক তার ওপর পাহাড়ি অঞ্চল, নতুন জায়গায় ক্ষিদে বেড়ে দশগুণ। একটু একটু শীত করতেও শুরু করেছে। হাতের কাছে হাল্কা শীতের পোশাক গায়ে দিয়ে খাবারের অর্ডার করলাম। সরসো কি শাগ, মাক্কি কি রোটি, রাজমা, আর পাঞ্জাবি স্পেশাল আচার।

ভোজনপর্ব শেষ করে বাস পাহাড়ি রাস্তা ধরে দৌড়তে শুরু করল। ঠাণ্ডা আসতে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল। চোখটা যেন ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স লাগানো কোনও ক্যামেরা।। পাগলের মতো সুন্দর লাগছিল চতুর্দিক। সত্যিকার ক্যামেরা বার করে বন্দি করতে শুরু করলাম দৃশ্য। বাস পৌঁছালো জম্মু, সবচেয়ে ওপরে পাটনিটপ-এ। ঠান্ডা তখন ৪-৫ ডিগ্রি। আর দৃশ্য দেখলে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, গুপী বাঘার মতো গেয়ে ওঠে মন, 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে।'

পাটনিটপের ঐতিহাসিক নাম হচ্ছে পাঠান-দ্য তালাও। এখানে প্রাচীন একটি তালাও বা পুকুর ছিল যেখানে জম্মুর রাজারা স্নান করতেন। এই পুকুরের একটি অংশ ওখানকার ইয়ুথ হোস্টেলের ভেতরে আছে। ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশরা পাঠান দ্য তালাও কে উচ্চারণ করতেন পাটনিটপ বলে, সেখান থেকেই পাঠান দ্য তালাও ভ্রংশ হয়ে পরিণত হল পাটনিটপ নামে।

সূর্য অস্ত গেছে। ভেবেছিলাম রাতে আর কী দেখার আছে? আড়াই দিনের ট্রেন জার্নি করে এসেছি সন্ধে বেলা থেকে রেস্ট নেব। কারণ পরের দিন সকাল থেকে আবার ১২ ঘণ্টা জার্নি শুরু হবে। শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। ঠাণ্ডাও বাড়ছে তাই হোটেলের ঘরে পর্দা টানা। কী মনে হল কে জানে হঠাৎ পর্দাটা সরালাম। দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। রাতে পুরো জম্মু শহরটা জ্বল জ্বল করছে। যেন তাপস সেন-এর মতো কোনও আলোর কারিগর শৈল্পিক মঞ্চ সাজিয়েছেন।

পরের দিন সকাল বেলায় পাটনিটপ থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে বাসে করে শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা দিলাম। পাটনিটপ থেকে শ্রীনগর প্রায় ৩৫০ কিমি কিন্তু সময় লাগে ১২ থেকে সাড়ে ১২ ঘণ্টা, শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এই সময়টা লাগে মূলত যানজট ও পাহাড়ি চড়াই উৎরাই-এর জন্য। এছাড়া আর্মি চেকিং তো সারাক্ষণ লেগেই আছে। পুরো প্রতিরক্ষা বেষ্টনীতে মোড়া এই ভূ-

স্বর্গ। দুপুরের খাওয়া আমরা আবার রাস্তার ধাবায় সারলাম। এখানে একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল। শ্রাবণী (আমার স্ত্রী) বলল, তাতাই-এর (আমার ছেলে) জন্য কলা কিনতে। আমি গেলাম ফলের দোকানে, গিয়ে জানতে চাইলাম কলা ১ডজন কত? শুনে দশ পা পিছিয়ে গেলাম! বলল প্রতি ডজন কলার দাম ১৫০ টাকা। সাহস করে জিজ্ঞাসা করি আপেল কত করে? দাম শুনে থার্টি টু অলআউট ছাড়া উপায় ছিল না। ১ কিলো আপেলের দাম দশ টাকা। এই শুরু হল আপেল খাওয়া। প্রতিদিন বোধহয় আমরা কিলো খানেক করে আপেল খেয়েছি। রাস্তার ধারে আপেলের জঙ্গলও চোখে পড়েছে।

আমরা পৌঁছলাম জওহর টানেলের কাছে। জওহর টানেল পেরোলেই আমরা ঢুকব কাশ্মীরে। এখানেই সব চেয়ে বড় চেকিংটা হয়। বাসের মাথা থেকে ব্যাগপত্র নামিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মীরা চেকিং চালাল। সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয়পত্র, ভোটার আইডি লাগল। বাচ্চাদের বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটও সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।

জওহর টানেল কে বলা হয় সপ্তম আশ্চর্যের একটি। এই টানেলটির আগে নাম ছিল বানিহাল টানেল। স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এই টানেলটির মধ্যে গড়ে ওঠে যানবাহন চলাচলের রাস্তা। ১৯৫৪ সালে দুই জার্মান ইঞ্জিনিয়ার আলফ্রেড টুনজ ও সি বাসেল মিলে এটি তৈরি করেন। দীর্ঘ এই টানেলটি প্রায় ২.৮৫ কিমি। দুটি লেন আছে, একটি দিয়ে কাশ্মীর যাওয়া যায় ও অন্যটি দিয়ে জম্মু। এটি সমুদ্রতট থেকে প্রায় ৭১৯৮ ফিট উঁচু ফলে এখানে খুবই ঠাণ্ডা। শীতকালে বরফে এই টানেলটি বন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যাকা যোগাযোগ রক্ষা করার এই একটি মাত্র স্থল পথ জওহর টানেল। তাই শত্রুপক্ষের সারাক্ষণ টার্গেট এটি। এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী খুবই সক্রিয়। দিনে প্রায় ৭০০০ গাড়ি টানেল পথে যাতায়াত করে।

আমাদের বাসও আর্মি চেক ইন-এর পর টানেলে ঢুকে পড়ল। ভেতরে পুরো ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে দেখা যাচ্ছিল একটি আলোর রেখা, আলোটি যখন স্পষ্ট হল, আমরা পৌঁছে গেলাম কাশ্মীর উপত্যকায়। এখানে আরেকটা মজার ঘটনা ঘটে। জম্মু থেকে জওহর টানেল অবধি বাস শুধু পাহাড়ের ওপরে উঠবে। আর জওহর টানেল থেকে বাস শুধু নীচে নামবে। কারণ কাশ্মীর তো উপত্যকা। শ্রীনগরের হোটেলে পৌঁছে সেদিন আর কিছুতেই শরীর সায় দিচ্ছিল না। তাই সামান্য কিছু পরে ঘুম। শ্রীনগরে পুজোর সময় আমাদের কলকাতার শীতের মতোই ঠাণ্ডা।

পরের দিন সকাল বেলায় একটা সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজে ঘুম ভাঙল। প্রাতঃরাশ সেরে ঠিক করলাম আজ শ্রীনগরে স্থানীয় সাইট সিইং করব। বিশেষ করে ডাল লেকে সময় কাটাবো। সবার প্রথম গেলাম, 'হজরত বাল' সেখান থেকে বিভিন্ন গার্ডেন। মোগল গার্ডেন, নেহেরু গার্ডেন, শালিমার গার্ডেন। এই সমস্ত গার্ডেনগুলো মূলত মোগল আমলে তৈরি। এর স্থিতি স্থাপত্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মূলত এখানকার ফুল ও গাছ মনে হয় কথা বলে। সুন্দরী কাশ্মীর এখানে আমাদের রঙিন অভ্যর্থনা জানায়।

চলে গেলাম কাশ্মীর ভ্যালি থেকে ১১০০ফুট ওপরে শঙ্করাচার্য টেম্পল। প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হতে হয়। রাজ গোপাল দ্বারা নির্মিত এই প্রাচীন শিব মন্দিরে ঢুকে মন শান্ত হবেই।

ডাল লেক-এ আমরা পৌঁছলাম গোধূলির একটু আগে। একটু মন খারাপ ছিল, কারণ আমরা হাউজবোট-এ থাকতে পারিনি। পুজোর সময় হাউজবোট বুকিং পাওয়া দুষ্কর। সমস্ত সিনেমায় দেখা দৃশ্য মাথায় নিয়ে যখন আমি শিকারায় উঠলাম, তখনকার অনুভূতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ, আমি তো কোন ছার। ডাল লেকে শিকারা করে নেহেরু পার্ক, চারচিনার দ্বীপ দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম! একটা গড়িয়াহাট থেকে বড় ভাসমান বাজার! বিক্রেতা সবাই জলে ভাসছে। আস্তে আস্তে সন্ধে নেমে এল। সমস্ত হাউজবোটের আলো জ্বলে উঠল, তার প্রতিফলন জলে। মনে হচ্ছিল অজস্র রঙবেরঙের টুনি লাইট দিয়ে সাজানো এক দীপাবলীর রাত।

পরের দিন সোনমার্গ, বাসে করে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল আমাদের সঙ্গে উল্টো স্রোতে বইছে একটা খরস্রোতা নদী। নাম শুনে চমকে উঠলাম। ইতিহাস-ভূগোলের ছোটোবেলা থেকে যতগুলো স্যার ছিলেন সবার মুখ ভেসে উঠল। সমস্ত পাঠ্য বইয়ের পাতা মনে পড়ে গেল। নদীর নাম 'সিন্ধু নদ' যা ভারতবর্ষের শুধু এই অংশ দিয়ে গেছে, বাদ বাকি পাকিস্তানে।

পৌঁছে গেলাম বরফের পাহাড় মোড়া মাত্র ৩৯২ জন মানুষের গ্রাম সোনমার্গ। ৯২০০ ফুট উঁচু সমুদ্র তট থেকে। সোনমার্গ কাশ্মীরের সোনা! এত সুন্দর জায়গা আমি তো এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভুটানের জুচালাপাসকে মাথায় রেখে বললাম। সোনমার্গে বাস ঢোকে না। চেক পোস্ট-এ বাস থেকে নেমে টাটা সুমো করে সোনমার্গ-এর শেষ অবধি যাওয়া যায়। এক মুহূর্ত ক্যামেরা বন্ধ করতে পারিনি। নাগাড়ে ছবি তুলে গেছি। পৌঁছলাম ইন্ডিয়া জিরো পয়েন্ট। এপার ভারত, ওপারে পাকিস্তান, মাঝে বইছে অমরনাথ নদী। চতুর্দিকে শুধু বরফে মোড়া। অদ্ভুত ব্যাপার এখানে কোনও সেনাবাহিনী নেই। না আমাদের, না ওদের। কারণ এখানে দুই দেশই তাদের পবিত্র অমরনাথ নদীকে সম্মান জানায়। ফ্ল্যাগ মিটিং-এ ঠিক হয় এখানে রাজনীতির আগে ভক্তির স্থান।

পরের দিন গুলমার্গ। গুলমার্গ মানে বরফ নিয়ে খেলা, রোপওয়ে চড়া। গুলমার্গে গিয়ে পৌঁছে এক বালতি দুধে একফোঁটা চুনা সমান অভিজ্ঞতা হল। ঈদের ছুটির জন্য রোপওয়ে বন্ধ। ফলে বরফের পাহাড়ে পৌঁছনোর কোনও উপায় নেই। মন খারাপ করে হা-হুতাশ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। সামনে শুধু একটি শিব মন্দির, একমাত্র দর্শনীয় স্থান যা বিখ্যাত 'আপ কি কসম' ছবির জয় জয় শিব শঙ্করের গানের জন্য। শুধু ওইটুকু দেখে যখন আপেল খেতে খেতে বাসে উঠে বসছি তখন যেন

ভগবান নিভৃতে বসে আমাদের মনের কষ্ট অনুভব করছিলেন। হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। ঠাণ্ডা বেড়ে গেল। বুঝতে অসুবিধা হল না প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসছে। সামনে একটি হোটেলের দিকে চোখ যেতেই চমকে উঠলাম, তাপমাত্রা দেখে তাপমাত্রা -৩°। খানিকক্ষণের মধ্যেই গায়ে কী যেন একটা পড়ছে অনুভব করলাম। বুঝলাম তুষার পাত হচ্ছে। ক্ষণিকের মধ্যে চারিদিক বরফের আস্তরণে ঢেকে গেল। দুধের স্বাদ পুরোপুরি সত্যিকারের ঘোলে মেটালাম। ফেরার পথে আপেলের বাগান ঘুরে গাছ থেকে নিজে হাতে আপেল পেড়ে খাওয়ার মজা পি সি সরকারের ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া ম্যাজিকের থেকেও বেশি।

পরের দিন সকাল বেলা মালপত্র বাসে বোঝাই করে বাস দৌড়ল ৮৭ কিমি দূরে পহেলগাঁও-এর পথে। পহেলগাঁও হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। লিডার নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ৪৫ কিমি জুড়ে অবস্থিত এই গ্রাম।

বাসে করে শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও যাওয়ার পথে বাস দু'বার দাঁড়ায় ভারতবর্ষের সবচেয়ে দামি কৃষি সম্পদ দেখাতে, কেশর। বর্তমানে কিলোপ্রতি কেশরের দাম ২ লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা। নীলবর্ণ কেসর ক্ষেত দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল হায়রে রাজনীতি, ভারতবর্ষ শুধু কেশর রপ্তানী করেই হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হতে পারত! কেশর ক্ষেতের পাশে লাইন দিয়ে কেশরের দোকান। পর্যটকরা অনেকেই লাইন দিয়ে কেশর কিনতে লাগল। কেশর কেনা হলে বাস আবার গিয়ে দাঁড়াল ভারতবর্ষের আর একটি আশ্চর্য ও জনপ্রিয় জায়গায়। কাশ্মিরী উইলো ব্যাটের কারখানায়। যেখানে তৈরি হয় আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট ব্যাট। পহেলগাঁও-এর রূপ ফেটে পড়া যুবতীর মতো। ৮৯৯০ ফুট উঁচু থেকে পুরো কাশ্মীর ভ্যালিটা দেখা যায়। এই গ্রামের চতুর্দিক দিয়ে বইছে খরস্রোতা লিডার নদী। পহেলগাঁওতে আমরা দু'দিন ছিলাম, সকাল বেলায় স্বাভাবিক ঠান্ডা হলেও, রাতের বেলায় বেশ হাড়কাঁপানো শীত।

পহেলগাঁও আরও একটি কারণে বিখ্যাত, তা হচ্ছে হিন্দি ছবির শুটিং-এর জন্য-যেখানে চোখ যায় সেখানেই মনে হয় কোনও না কোনও হিন্দি সিনেমার দৃশ্য শুটিং হয়েছে। বিশেষ করে যখন ঘোড়ায় চড়ে ছোটা সুইজারল্যান্ড পৌঁছলাম। যদিও বুঝতে পারিনি কেন একে ছোটা সুইজারল্যান্ড বলে। এটা সুইজারল্যান্ডের বাবা, হয়তো সুইজারল্যান্ডকে বলা উচিত ছোটা পহেলগাঁও। এখানে বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানের মধ্যে একটি বেতাব ভ্যালি। এই উপত্যকাটি বেতাব ছবির শুটিং-এর পর থেকে এই নামে খ্যাত। আর একটি বিখ্যাত জায়গা পহেলগাঁও থেকে ১৬ কিমি ওপরে চন্দনবাড়ি, যেটাকে বলা হয় 'গেটওয়ে অফ অমরনাথ' এখান থেকে পবিত্র অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়। কথিত আছে, শিব নাকি অমরনাথ যাওয়ার পথে তাঁর ষাঁড়টিকে পহেলগাঁওতে বেঁধে রেখে গেছিলেন। তাই পহেলগাঁও-এর আসল নাম 'ব্যাহেলগাঁও'। উচ্চারণের ফলে পহেলগাঁও-এ পরিণত হয়েছে। আর চন্দনবাড়িতে তাঁর মাথার চাঁদ রেখেছিলেন। তাই বোধহয় পূর্ণিমার দিন পহেলগাঁও-এর রূপ ফেটে পড়ে। আর আমরা ভাগ্যের ফেরে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ছিলাম পহেলগাঁওতে। বরফে পাহাড়ে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে সারা গ্রামটা চকচক করছিল। ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত ঠুকে, হাড়ে হাড় কাঁপিয়ে সামনে আগুন পোয়াতে পোয়াতে এই দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল এই বুঝি স্বর্গসুখ।

বিষাদের ঘণ্টা বাজল, ফিরতে হবে। সমস্ত স্মৃতিগুলো গুছিয়ে 'স্মৃতি ব্যাঙ্কে' লক করে মালপত্র নিয়ে রওনা দিল বাস জম্মুর উদ্দেশে। জওহর টানেল পাটনিটপ পেরিয়ে বাস রাতে পৌঁছল জম্মু। রাতেই ট্রেন ১২৩৩২ ডাউন হিমগিরি সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। ট্রেন ছাড়ল রাত ১২টায়। মনটা খুব খারাপ লাগছিল-২০১৯ পেরিয়ে যখন ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢুকল, জার্নির ক্লান্তি থাকলেও তখন আমি আমার প্রিয় কলকাতার বুকে কাশ্মীর থেকে শুদ্ধ হয়ে আসা এক চনমনে বালক। আবার জীবন শুরু হল।

সিনেমায় ‘হি-ম্যান’, সিরিয়ালে ‘শি-ম্যান’

এই বৈপরীত্যের কারণ কী? বাঙালি ‘বিবি’রাই কি শুধুমাত্র বাংলা সিরিয়ালের দর্শক! এখন তো অনেক ‘বাবু’ও অফিস থেকে, তাসের আড্ডা থেকে, পাড়ার রকের আলোচনা থেকে চটজলদি ফেরেন সিরিয়াল দেখবেন বলে। সুযোগ না পেলে জেনে নেন, ‘আচ্ছা, অমুকের কী হল?’ চোখে না দেখার সুযোগ হলেও কানে দেখে নেওয়ার সুযোগ ছাড়তে নারাজ সাত থেকে সাতাশি। কী সেই অমোঘ টান? বাণিজ্যিক সিনেমায় যেখানে হিরোইনদের দেখা যায় হিরোদের বক্ষ সংলগ্না হয়ে নেচে কুদে ঘুরে বেড়াতে, সেখানে সিরিয়ালে কিন্তু নারী চরিত্রের জয়জয়কার। রহস্যটা কী? জানিয়েছেন এই সময়ের জনপ্রিয় স্ক্রিপ্ট রাইটার **লীনা গঙ্গোপাধ্যায়**। কথা জুড়লেন **রমাপদ পাহাড়ি**

সিরিয়াল প্রেম, জমকালো বিয়ে, পরকীয়া, বউ-শাশুড়ি যুদ্ধ, চুকলি, যমজ, পুনর্জন্ম, আধিভৌতিক অথবা পারিবারিক খুনখারাপি। এগুলোর সঙ্গে আবার যোগ হয় কিছু আজগুবি বিষয়, যা দর্শককে চুম্বকের মতো টানে। এর মাঝে থাকে একটা সাসপেন্স। কোনও সাধারণ ঘটনা দেখাতে গিয়েও একটি চিত্ত উত্তেজক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক জুড়ে দেওয়া হয়। আবার প্রত্যেকটা ডায়লগের পরে প্রায় সবার মুখের অভিব্যক্তি দেখানো হয়। তবুও সিরিয়াল দেখায় দিনে দিনে জোয়ার বাড়ছে। শুধু কি সিরিয়ালের মেয়েদের জামা-জুতো-শাড়ি-গয়না প্রভৃতি মহিলা দর্শকদের আকর্ষণের প্রধান বিষয়? নিন্দুকেরা বলেন, শহুরে শিক্ষিত, আধা শিক্ষিত ঘরনিরা সিরিয়াল ভক্ত। যাঁরা বেশি শিক্ষিত, তুলনামূলকভাবে আধুনিক, তাঁরা দেখেন হিন্দি সিরিয়াল। আর যাঁরা কিছুটা কম শিক্ষিত তাঁরা দেখেন বাংলা সিরিয়াল। এই লিস্টটাকে আরও একটু লম্বা করে নতুন একটা দল যোগ করা যায়। তা হল আধুনিক তরুণী। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এবং বিয়ে করে সবেমাত্র সংসারী হয়েছে এমন মেয়েদের বেশিরভাগই নাকি সিরিয়ালের পোকা! সত্যিটা কী? সিরিয়াল দেখার সময় সত্যিই কি আমাদের বৌদ্ধিক লেভেল জিরোতে পৌঁছে যায়? এমন নানাবিধ জিজ্ঞাসাকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।

সিনেমায় ‘হি-ম্যান’, কিন্তু সিরিয়ালে ‘শি-ম্যান’দের জয়জয়কার। কারণটা কী? লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, ‘একটু অন্য ধরনের সিনেমাতে কিন্তু হিরোইনদের কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যায়। তবে পিয়োরলি কমার্শিয়াল সিনেমা হলে একটা ট্রেন্ড থাকে, মেয়েরা ততটা গুরুত্ব পায় না। পুরুষকেন্দ্রিক সিনেমার রমরমা আমরা প্রায়শই দেখতে পাই। গরীব ছেলে, অন্যদিকে ধনী মেয়ে। ছেলেটি খুব ফাইট করছে, সংগ্রাম করে উঠছে। এইসব কমার্শিয়াল সিনেমা একটা ফর্মুলা মেনে চলে, যেগুলোতে নারীদের ভূমিকা নগণ্য। অন্যদিকে সিরিয়ালে দেখা যায় নারীদের প্রাধান্য। এখানে একটি বা দুটি চরিত্র গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও দেখা যায় মহিলারাই সিরিয়ালের সবচেয়ে বেশি অংশজুড়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে কথা বলার আগে সিরিয়ালের জনপ্রিয়তার দু-একটি কারণের কথা না উল্লেখ করলেই নয়। প্রথমত, টেলিভিশন এখন পার্ট অফ লাইফ। মানুষ ঘরে বসে সবকিছু দেখতে পান। যেমন সকালবেলা উঠে মানুষ বাজার করতে যান, মায়েরা বাড়িতে রান্না করেন, তেমনি টেলিভিশন দেখেন। সিরিয়াল কখনওই সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার মতো আলাদা কোনও বিষয় নয়। এই বিনোদনটা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, টেলিভিশনকে আমার খুব আপন মনে হয়। সিরিয়ালে দেখা চরিত্রগুলো আমার ড্রয়িংরুম বা শোবার ঘরের চরিত্র। বহু সময় নিজের বাড়ির মেম্বারদের প্রতিবিম্ব এঁদের মধ্যে খুঁজে পাই আমরা। একধরনের সেলফ আইডেন্টিফিকেশনও হয় যে, এটা আমিও হতে পারতাম অথবা এটা আমার জীবনের গল্প। এই জায়গা থেকে আমার ধারণা, টেলিভিশন মানুষের কাছে এত জনপ্রিয়।’

হিন্দি সিরিয়ালের সঙ্গে বাংলা সিরিয়ালের তুল্যমূল্য বিচার চলে?— ‘এককথায় কোনও তুলনা টেনে আনাটা বৃথা। প্রথম এবং একমাত্র কারণ, বাজেট। বাংলা সিরিয়ালের বাজেট এতটাই কম থাকে যে, তার মধ্যেই প্রযোজক-পরিচালককে সবকিছু টানাপোড়েন করে সামলাতে হয়। আমি বলছি না যে হিন্দি সিরিয়ালে ভাল স্টোরি নেই। তা যদি না থাকত, তাহলে হিন্দি সিরিয়ালের রিমেক বাংলাতেও হিট করত না। হিন্দি সিরিয়াল যেখানে সিকোয়েন্স নির্ভর, বাংলা সিরিয়াল সেখানে ডায়ালগ নির্ভর। বাংলা সিরিয়ালে এমন সব ডায়ালগ থাকে যেগুলো রান্নাঘরে কাজ করতে করতে কিংবা ড্রয়িং রুমে বসে থেকেও কল্পনা করে নেওয়া যায়। দৃশ্যের চাইতেও শ্রবণে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বাংলা ধারাবাহিকে।’

শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায় ব্যাখ্যাটিকে সহজবোধ্য করতে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ টেনে বলেন, ‘একজন অন্ধ মানুষ আমার লেখা স্ক্রিপ্টের একটি সিরিয়াল দেখতেন। সেই সিরিয়ালটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর ছেলে কিংবা মেয়ে কোত্থেকে জানি না, আমার ঠিকানা জোগাড় করে একটি চিঠি

ইষ্টিকুটুম

জল নূপুর

পাঠিয়েছিলেন. তার বয়ানটা ছিল মোটামুটি এরকম— আমার বাবা অন্ধ। তিনি অমুক সিরিয়ালটি শুনতেন। কেন আপনারা সেটি বন্ধ করে দিলেন? অর্থাৎ রেডিও নাটকের মতো ওই ভদ্রলোক শুনতেন। চরিত্রগুলোকে মনে মনে এঁকে নিতেন। এর থেকে বোঝা যায়, বাংলা সিরিয়ালে কতটা ডায়ালগের উপর জোর দেওয়া হয়। এটাও কিন্তু সিরিয়াল দেখার অন্যতম আকর্ষণ।'

অনেকেই বলে থাকেন, হিন্দির চাইতে বাংলায় সংস্কৃতি নির্ভর সিরিয়াল বেশি হয়। —'কই, আমার তো তেমন কিছু মনে হয় না। সিরিয়ালগুলিতে সাহিত্য বা সংস্কৃতির কচকচানি তেমনভাবে থাকে বলে আমার জানা নেই। হিন্দিতেও যে দু-একটি সিরিয়াল আমি দেখেছি, সেগুলিতে শুধুমাত্র বউমা-শাশুড়ির ঝগড়া নয়, বেশ ভাল গল্প ছিল। বাংলা সিরিয়ালেও গল্পের দিকটা কোনও অংশে কম নয়।'

পরিবারের সদস্যদের উপর সিরিয়ালরে প্রভাব কতটা পড়ে বলে মনে হয়? —'দেখুন, সবকিছুরই সু এবং কু আছে। যাঁরা দিনের পর দিন সিরিয়াল দেখেন অথবা সিরিয়াল ম্যানিয়াতে ভোগেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দু-একটি জিনিস তো লক্ষ্য করা যায়ই, যেমন তাঁরা বাক্যবাণে চোখা হবেনই হবেন। কথার পিঠে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেটা সিরিয়ালের ডায়লগ শুনে শুনেই অজানতে ঠোঁটের ডগায় তুলে আনবেন। জীবনটা কখনও কখনও নাটকও হয়ে যেতে পারে। অনেকে ভাবতে পারেন, সিরিয়াল দেখলে মেয়েদের চাহিদা বেড়ে যায়। পরকীয়ার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। সেটা যে একেবারেই নয়, তা বলছি না। কিন্তু আরেকটি দিকও তো বেশ উজ্জ্বল, স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। বাংলা সিরিয়ালে মেয়েরা বেশ সংগ্রামী হয়। এই লড়াই দেখতে দেখতে 'চাহিদা'র বদলে 'সংগ্রাম' এর দিকটাও তো মেয়েদের মধ্যে বাড়তে পারে! তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যদি এই সংগ্রামের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে, তাদের জীবনে প্রাধান্য পায়, তাহলে তো বেশ ভালই বলতে হয়। মেয়েরা যে বহু বাধা, নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সিরিয়াল। আমি চাই, এই পজিটিভিটিটা আসুক সমাজের নতুন প্রজন্মের মধ্যে।'

লীনা গঙ্গোপাধ্যায় মানেই চিত্রনাট্যে 'ভাষা'র প্রাধান্য। —'ভাষাগত দিকটিতে পরিবর্তন আনব বলেই যে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে ভাষার বদল আনি তা নয়, বরং যে অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে সেই পরিবেশের প্রেক্ষিতে চরিত্রগুলির মুখে আঞ্চলিক ভাষা সংযোজন করি। জঙ্গলমহলের মেয়ের মুখে যদি আমাদের কলকাত্তাইয়া ভাষা ব্যবহার করতাম, তাহলে সত্যিই কি ভাল লাগত! সাঁওতালদের ওরিজিনাল ভাষা যদি ব্যবহার করতাম, তাহলে তা দর্শকদের পক্ষে বুঝে ওঠা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের 'লোকেল' ব্যবহার করেছিলাম। তার সঙ্গে কিছুটা ইম্প্রোভাইজ করে একটা মিক্সড ভাষা কোনও চরিত্রের মুখে কথ্যভাষা হিসাবে বসানো হয়েছিল। সেটা মানুষের ভালও লেগেছিল। ওড়িশার গল্প বলতে গিয়ে সেই অঞ্চলের কিছু ভাষা যদি না ব্যবহার করি, তাদের প্রথাগুলো যদি না নিয়ে আসি, তাহলে বিষয়টা ঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না বলে আমার ব্যক্তিগত মত। রীতিনীতি, আচার-সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষাটা এসেছে স্বাভাবিক ভাবে। শুধুমাত্র ভাষা কখনও প্রাধান্য পায়নি।'

সিরিয়াল দেখতে বসলে নাকি বৌদ্ধিক লেভেলটা 'জিরো' তে চলে যায়? সফল চিত্রনাট্যকারের বাউন্ডারি হাঁকানো জবাব, 'এটা আমি মানি না। আমারই লেখা সিরিয়াল 'ইষ্টিকুটুম'-এর একটি সোশ্যাল সাইট আছে। সেই সাইটের সদস্যরা মূলত বিদেশি। এঁরা খুব এলিট ক্লাস। কেউ ডাক্তার, কেউ আইনজীবী, কেউ সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে টপ লেভেলে রয়েছেন—তাঁরা কিন্তু সিরিয়াল দেখেন। আরও একটি ঘটনার কথা বলি, একজন হাইকোর্টের বিচারক সম্প্রতি আমাকে জানিয়েছেন, তিনি 'জল নূপুর' না দেখে ঘুমোতে যান না। কী বলবেন এঁদের! এঁরা কি তাঁদের বৌদ্ধিক লেভেলটাকে জিরো করে সিরিয়াল দেখেন! না, কিছুতেই মানতে পারলাম না। আমি বলব, এঁরা বুদ্ধিবৃত্তি বজায় রেখেই সিরিয়াল দেখেন। যতটা গ্রহণ করার করেন, যতটা গ্রহণ করার নয় ততটা সিনেম্যাটিক ভেবে মেনে নেন।'

যাঁরা শুধু ঘর সামলান, তাঁরাই নাকি মূলত সিরিয়ালের দর্শক? — 'প্রতি শুক্রবার সিরিয়ালের টিআরপি বেরোয়। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে যদি কোনও সিরিয়াল দেখেন, তাহলে সেই সিরিয়াল যে সর্বজনগ্রাহ্য তা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। অর্থনৈতিক লেভেল ধরেও আঙ্কিক নিয়মে সেই পরিসংখ্যান প্রকাশ হয়। বলা ভাল, সাপ্তাহিক পরীক্ষার উত্তরপত্র হাতে পাই আমারা প্রতি শুক্রবার। সেখানে মোটামুটিভাবে দেখেছি, চল্লিশ উত্তীর্ণ মহিলাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এছাড়া অন্যান্য ক্যাটিগরি তো রয়েইছে। পঁচিশ উত্তীর্ণ পুরুষরাও কিন্তু বেশ ভাল সংখ্যক সিরিয়ালের দর্শক। আর এমন নয়, যাঁরা শুধুমাত্র ঘর সামলান বা তেমন কিছু করেন না, তাঁরাই শুধু সিরিয়ালের দর্শক। কর্মরত মহিলা বা পুরুষরাও সিরিয়ালের দর্শক। যারা কোনওকিছু হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি তাঁদের যেমন দর্শক হিসাবে পাই, তেমনি যাঁরা কিছু হতে পেরেছেন, তাঁদের সংগ্রামটাও সিরিয়াল দেখায়। তাই কর্মরত বা কর্মরতারাও সিরিয়ালের দর্শক। ভবিষ্যতে ওয়ার্কিং লেডির সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, তাঁরা সিরিয়ালের আয়নায় নিজেদের দেখতে ঠিক সময় বের করে সিরিয়াল দেখবেনই দেখবেন। এ বিষয়ে আমি সেন্ট পার্সেন্ট আশাবাদী। সবশেষে বলি, সিরিয়ালের ষোলোআনা বাড়বাড়ন্তের জন্য, আরও বেশি দর্শকের আশায় আমরা ভবিষ্যতেও নারীদেরই প্রাধান্য দেব।'

মেগায় নারী চরিত্রই ঠিক করে পুরুষের অবস্থান

দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত

দিদি, এবার বাবা।
বয়স?
ওই ৫৫ কি ৬০...
O K নায়কের বাবা তো?
হুম, সীতেশ রায়চৌধুরিকে নেব?
না, বাবুদাকে দেখ।
দিদি বাজেটটা একটু হাই।
হোক। মাসে চারদিন নেব। ব্লকে খেলব, যে কোনও ঘরের 'এল' ধরে নানা কথা বকিয়ে নেবো। দ্যাখ সুশান্ত, বাড়ির বাবা অলওয়েজ ফর্সা নিবি, আর বয়স হলেও, এককালে খেলতো এমন 'লুক' চাই।
দিদি সীতেশদাতো এককালে ফুটবল খেলতো...
ধ্যাৎ, তুই ডকুমেনট্রি কর- এই সস্তায় পুষ্টিকর মেগা তোর জায়গা নয়। ওরে পাগলা এ খেলা সে খেলা নয়। ধর ১৫৬ পর্বের পর গল্প ভ্যাদভ্যাদে হয়ে গেল, নায়ক নায়িকার প্লটেও নতুন করে জার্ক আনা যাচ্ছে না। তখন নায়কের বাবা সুন্দর দেখতে হলে তার আগেকার মানে কলেজ বেলার প্রণয়ীর বাচ্চা, সেই আসলে বড় ছেলে—এসব ফাঁদা যায়। একটু রোম্যান্টিক বাবা ট্রাই কর। সোমেশ, কুন্তল, এঁদের ধর।
রোলটা কী বলব?
ওই দ্যাখ, সবটা শুনেও একথা জানতে চাইছিস। ওরে কেউ জানতে চাইবে না। ডেট আর রেট জানবে বড় জোর। সকলেই জানে মেগায় পুরুষ হল সোনার পাথরবাটি।

এটা কোনও কষ্ট কল্পনা নয়। এটা যে কোনও মেগার রান্নাঘরে কান পাতলেই শোনা যায়। শুরুটা হয় খুব জগঝম্প করে। ধরা যাক 'ভাগ মিলখা ভাগ' মেগা হচ্ছে। নায়ক এক দৌড়বীর। একমাসের মাথায় তার প্রেম পেকে বিয়ে হবে, দুমাসের মাথায় তার বউ হয় শাশুড়ির থাপ্পড় খাবে নয় ব্যাগ গুছিয়ে বাপের বাড়ি যেতে যাবে। বাসস্টপে মাথা ঘুরবে এক আগন্তুক তার প্রাণ বাঁচাবে। বৌ আর মায়ের সাঁড়াশি আক্রমণে হিরো তখন যথাযথই ভাগ মিলখা ভাগ।

মাসে ২৬ পর্ব, দুটো মহাপর্ব। সারা মাসে সে মাঠে যায় না, বাজার যায়। জুতো আর ট্র্যাকস্যুট তখন বেডরুমের প্রপস। ড্রইংরুম, কিচেন, বেডরুম, মাঠ হল ওই সাড়ে তিনটে ঘর। আর একটা বাঁকানো সিঁড়ি। তার যাবতীয় দৌড়ঝাপ তখন এখানেই। দুই নারী হাতে তরবারি—মাঝখানে অসহায় ফুটেজ কারবারি।

টিভির নায়কের কোনও অফিস টাইম নেই, কামাই করলেও চাকরি যায় না। তার কাছে চাকরি মানে একটা ল্যাপটপ। আর মাঝে মধ্যে অফিস গেলে একটা ঘর। বড়বাবু থেকে বেয়ারা সবাই সেখানে আসে। নায়ক চেয়ারে বসে কিম্বা চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তিন পাতার সংলাপ বলে চলে। আসলে ফ্লোরে এক চিলতে খালি জায়গায় কোনওমতে তৈরি হয়েছে তার দুই দেওয়ালের আপিস। বাকি ৯৭ শতাংশ জুড়ে তার বাড়ি, ১৮ শতাংশ জুড়ে রান্নাঘর। মেগায় নায়কের কোটি টাকার ব্যবসা করতে কিম্বা একটা গোটা গীতবিতান লিখতে সময় লাগে ছ'মিনিট। তাও ঘরের দৃশ্যের মাঝে মাঝে ২+২+২.৩০ ভাগে গোঁজা। অথচ নায়িকার চা বানাতে ২৩ মিনিট লাগে। সোমবার যদি নায়িকার সর্দি হয়, সে সর্দি সারতে লাগে শনিবার end। এর মধ্যে দুবার ডঃ সেন আসবেন। মঙ্গলবার তিনি রোগটাই ধরতে পারবেন না। জিক জ্যাক সকলের চিন্তিত মুখ। সকলের মুখে প্রবল দুশ্চিন্তা—ঈশ্বর তুমি কেন সর্দি আবিষ্কার করলে! শুক্রবার নাড়ি দেখে ইনজেকশন দিলে তবে না শনিবার সর্দি নামবে। বৃহস্পতিবার ঘুমন্ত নায়িকার পাশে চিন্তিত নায়ক একা সারারাত জেগে বসে থাকবে। অসুখ যেহেতু সর্দি তাই ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা নারী কণ্ঠের গান চালাবেন— ঝর ঝর বরিষে বারি ধারা।

বাবার অবস্থা আরও খারাপ। অশ্বডিম্ব টাইপস। সংসারে যেদিন সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস আসে, যেদিন তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়, সেদিনই ঠিক তখনই তাঁর বুকের বাঁদিকটা খামচে ওঠে। তারপর বারো দিন মানে দু হপ্তা টানটান উত্তেজনা। রোজ মাঝে

মধ্যেই বাবাকে দেখা যায়। মুখে নল গুজে চোখ বুজে শুয়ে আছে। একই ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলে —তাতে কী? লোকে তখন শাশুড়ির কথা ভেবে কাতর, বাবার চারপাশ নিয়ে থোড়ি ভাববে? হাসপাতাল করিডর, ধূধূ রান্নাঘর, শোবার ঘরে অসহায় দ্বিতীয় বালিশ, এসবের মাঝখানে পর্দা জুড়ে শাশুড়ি। তার মনের অবস্থাটাই তো মেগা। 'তুমি পাথর নাকি প্রাণ-ভগবান' ঘরে ঘরে তখন ব্রত রাখার পালা। বাবা ভ্যানিশ, মাকেই দেখা যায়। আরে ভাই— এনিয়ে হাসির কী আছে? মা যে বিড় বিড় করে পাতার পর পাতা মনের কথা বলেন— মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সেখানে 'তুমি' 'তুমি' বলে যে মাঝে মাঝে আর্তনাদ— সে তো

বাবার উদ্দেশ্যেই। তারমানে উনি পরোক্ষে আছেন।

কোটিপতি বাবার দুটো পাঞ্জাবি। একটা হাল্কা গোলাপি ভেতরের গেঞ্জি দেখা যায়, আরেকটা তসরের। নাতির আশীর্বাদ নিজের বিবাহ বার্ষিকী, বন্ধুর শ্রাদ্ধ, বৌমার ওষুধ কিনতে যাওয়া মানেই ওই তসর। ঘরে পিঙ্ক, বাইরে তসর। ড্রেসাররা বাবাদের নিয়ে খুশি। শুধু অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর-এর মাথায় একটাই চিন্তা— উনি যদি কাল নিজের স্যান্ডোটা না পরে আসেন?

নায়ক আইটিতে থাক বা অ্যাডওয়ার্ল্ডে, বিয়ের পর সে আর থ্রি কোয়ার্টার পরে ঘুমোতেও যাবে না। রাত হলেই সে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে নেতাদের মতো সংসার নামক ভারতবর্ষে ঘুরবেন। বউ নামক হাইকমান্ডের পিছু পিছু।

চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এসব জানেন, দেখেন, তাদের রাতের ঘুম চলে যায় এই ভেবে যে কাল রান্না ঘরের দৃশ্যে নায়িকা কী পরে রান্না করবে, ব্যোমকাই না বাইলুম? কানে ঝোলা দুল, না টেপা দুল? চুলটা খোলা না হাফ নট? অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর-কে এস এম এস পাঠায় চিন্তিত চ্যানেল— কাল পর্ণার দুভাবে চুল বেঁধে ওয়াটস অ্যাপে পাঠিও, আমি দেখে ফাইনাল করব।

তবে বাড়ির পুরুষদের রোজ শুটিং-এ সাত সকালে দুটো কি দেড়টা দৃশ্যে লাগেই। মেকআপ হেয়ার ইত্যাদি করতে তাদের যে আড়াই তিন ঘণ্টা লাগে না তাই কোনওমতে পাউডার ঘষে অ্যান্টিগ্লেয়ার চশমা পরে তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়ে, পরে মা শাশুড়িরা এসে টুকরো টুকরো বলে সে দৃশ্যে সম্পূর্ণতা দান করেন।

এই বাবারা মাকে কয়েকটা কথা বলবেই বলবে, মানে সংলাপের ....

১। তুমি আমায় সারাজীবন ভুল বুঝলে সুপর্ণা/মালিনী/সুমনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

২। তুই আমায় ভুল বুঝলি বড় খোকা।

৩। বয়স হয়েছে বলে ভাবিস না যে আমি একটা বোঝা।

৪। বৌমা, তুমি আসায় আমার সংসারটা সম্পূর্ণ হল।

৫। (বৌকে) নিজের মেয়ে আর ছেলের বউ-এর জন্য তোমার আলাদা বিধান কেন?

৬। অনুতাপ আর বিবেক বোধের জ্বালায় আমি সারা জীবন পুড়ছি।

৭। আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে আমি এই বাড়িটা বানিয়েছি।

মোদ্দা বিষয় হল মেগা সিরিয়ালে পুরুষ ঠিক ততটাই জরুরি, যতটা জরুরি সলমনের জীবনে জামা, রাখি সাওয়ান্তের ওড়না। প্রত্যেকটা বাড়ির শো কেসে যেমন রবীন্দ্র রচনাবলী সাজানো থাকে, থরে থরে বঙ্কিম, শরৎ থেকে সুনীল, শীর্ষেন্দু, তেমনই থরে থরে সাজানো থাকে দাদু, জ্যেঠা, বাবা, কাকা, বড়দা, সেজদা, মামা। এরা যখন খুশি যাত্রায় থাক, কিম্বা সিনেমায়, চিত্রনাট্যকারের ভুরু তাতে একটুও কুঞ্চিত হয় না। বরং বাড়ির তিন নম্বর ঝি টেপির মা তিনদিন ছুটি চাইলে মুশকিল! যে যেখানে বাসন মাজে সেখানেই শাস্তিস্বরূপ শাশুড়ি নতুন বউকে বাসন মাজতে পাঠাবে। মাস্টার ফ্রেমে টেপির মা মাস্ট।

তবে হ্যাঁ যেহেতু বিয়েতে পুরুষও চাই, তাই ঝিধস্ত মেগাকে তন্বী করতে যখনই বিয়ের আয়োজন করা হয় তখন পুরুষের দাম বাড়ে। ফুলসজ্জা পর্যন্তই তার কেরামতি। তারপর সে পুরুষ অফিসও যাবে কখন, তা বিশ্লেষিত হবে বৌমার পারসপেকটিভ থেকে।

মেগায় প্রত্যেক সফল নারীর পেছনে একজন পুরুষ থাকে। মেগায় প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে দু তিন জন নারী থাকে। এই অনুপাতই বলে দেয়, কে কোথায় দাঁড়িয়ে। কোথায় দাঁড়িয়ে রমণী আর কোথায় দাঁড়িয়ে রমণী মোহন।

ঢাকার কুট্টি কৌতুক

বাংলাদেশের অধুনা পূর্ব বাংলার কুট্টি সম্প্রদায়দের নিয়ে মজার গল্পের শেষ নেই। তারই কটি সংকলন করেছে **সুমন ভাদুড়ী**, আমাদের মনটা ভাল করে তুলতে।

● মাছের বাজারে গিয়ে খদ্দের জিজ্ঞেস করলেন 'ওই মিরলা মাছটা কত দিমু?'

মাছওয়ালা : চাইর ট্যাহা দিয়েন কত্তা।

খদ্দের : কও কী? ওই টুকুন মাছ চাইর ট্যাহা? না, দুই ট্যাহা দিমু, দিবা? এই বলে খদ্দের মাছের কান দেখতে লাগলেন। মাছওয়ালা বাধা দিয়ে বলল, 'মাছের কান দেখতে হইব না। আগে যা লাল ছিল তা ছিল, আপনার দাম শুইন্যা হালায় কান শরমে আরো লাল হইয়া গ্যাছে। থুইয়া দেন।'

● রাস্তার ধারে বসে এক দোকানি তরমুজ কেটে বিক্রি করছে। এক খদ্দের এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে

খদ্দের : তরমুজ কত কইর‍্যা ফালি?

দোকানি : চাইর আনা কইর‍্যা কত্তা।

খদ্দের : কও কি গো? গলা কাটবার লাগছো। ওই টুকু ফালি হালায় চাইর আনা? দুই আনায় হইবো না?

দোকানি : পয়সা দিতে হইব না কত্তা, খাইয়া যান

খদ্দের : পয়সা দিতে হইব না? কেন?

দোকানি : কইলাম তো, পয়সা দিতে হইবো না আপনা, খাইয়া যান। বিকালে মালিক আইলে কমুঅনে কুত্তায় খাইয়া গেছে।

● এক কুট্টির ছেলে ক্লাসের পরীক্ষায় দশম স্থান পেয়েছে। স্বভাবতই তার বাবা দারুণ আনন্দিত এবং গর্বিত, ছেলের সঙ্গে কাউকে কথা বলতেই দিচ্ছেন না তিনি। সবাইকে বলছেন 'শিবুর হালায় কথা কওনের সময় নাই। শিবু দশে দশ হইছে।' শিবুর এক সহপাঠী এসে জিজ্ঞেস করল, 'মেসোমশাই শিবু আছে?'

বাবার সেই এককথা, 'শিবুর হালার কথা কওনের সময় নাই। শিবু হালার দশে দশ হইছে।'

ছেলেটি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বলল, 'মেসোমশাই আমি শিবুর বন্ধু শম্ভু। আমি দশে এক হইছি।'

'তুমি দশে এক হইছ, কও কি হালায়? এই বলে বাবা ছেলের উদ্দেশে হাঁক পাড়লেন, 'শিবু, ও শিবু! দেইখ্যা যা হালায়, তর বাপ আইছে।'

● এক স্যুটেড-বুটেড ভদ্রলোক একটা ফেল্ট হ্যাট কিনতে দোকানে গেছেন। দেখেশুনে একটা হ্যাট পছন্দ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এটার দাম কত ভাই?'

দোকানি : পঞ্চাশ ট্যাহা দিয়েন?

ভদ্রলোক : কও কী? এ যে গলাকাটা দাম!

দোকানি : আপনে কত দিবেন কত্তা?

ভদ্রলোক : দশ ট্যাহা দিমু।

দোকানি : টুপি কিইন্যা কাম নাই কত্তা। মালশা কিইনা নিয়া যান গা,— খাইবেন, হাগবেন, মাথায়ও দিবেন।

● ক্লাসে একটি কুট্টি ছাত্র ভর্তি হয়েছে। মাস্টার মশাই তাকে ডেকে বলেন, এই পোলা, তর নাম কী?

আইজ্ঞা, আব্দুল খালেক।

নিজের নামের বানান জানস?

ক্যান জানুম না স্যার?

কও দেখি।

আকাশের আ, বাতাসের ব আর সাতালের ধূল, এই হইল গিয়া আব্দুল, মায় কয় খা, বাবায় কয় ল্যাখ, এই হইল আপনার খালেক।

এই বানান ক্যাডা শিখাইছে?

আমার আব্বা।

তর আব্বারে আমার সেলাম দিস।

● জুতোর দোকানে জুতোর দরদস্তুর চলছে।

এই জুতা জোড়ার দাম কত?

কুড়ি ট্যাহা কত্তা।

পাঁচ টাকায় হবে না?

বগলের মাপ দ্যান কত্তা।

কেন? বগলের মাপ নিয়া কী করবা?

পায়ের মাপ ন্যাও।

পাঁচ টাহার জুতা হালায় পায়ে দিয়া রাস্তায় হাঁটোন যায় না। ওইডা বগলে রাইখ্যা হাঁটতে হয়।

● এক কুট্টি এক শ্রাদ্ধ বাড়িতে গিয়া জিজ্ঞেস করল—

আইজ্ঞা, যার ছেরাদ্ধ তেনারে তো দ্যাখত্যাছি না।

তাঁকে দেখবেন কী করে? তিনি তো মারা গেছেন।

আহা, কী কইর‍্যা মারা গ্যালেন?

আজ্ঞে সর্পাঘাতে।

কোথায় ছোবল দিছিল?

আজ্ঞে, চোখের ওপর, ভুরুর কাছে।

চোখটা জোর বাইচা গেছে। চক্ষু-রতন বড় রতন। ওনার কপালডা ভাল আছিল। তাই বাঁইচ্যা গেছেন।

● বাবু বাজার করতে গেছেন। এটা ওটা কেনার পর কচু কিনতে গেলেন।

তোমার কচুর সের কত?

আট আনা কত্তা।

কচুখান তো ভালই। কিন্তু গলায় ধরবো না তো?

কী যে কন কত্তা, পাঁচশ ট্যাহা খরচ কইর‍্যা ঘরে বিবি আনছি, হেই কোন দিন গলায় ধরল না। আপনার আট আনা সেরের কচু হালায় গলায় ধরবো?

পূর্ণ-শূণ্য

অপরাজিতা কোনার

আকাশ ভরা তারা, আলোয় ভরা উঠান
সাগর ভরা জল, আর আগাছার জঙ্গল
এদিকে রাস্তা ভর্তি লোক, টাইম কলে লাইন
বাড়ির পর বাড়ি, অফিসে টেবিল ভর্তি ফাইল।
মানুষের পকেট ভর্তি টাকা আর ভুবন জোড়া সমস্যা।
এগুলো তো তোমরা দেখ, এগুলো তোমরা ভাব।
আমার কাছে তো সবই শূণ্য, কেবল শুধু ফাঁকা
শূণ্য গড়ের মাঠ, নাইকো চাঁদের হাট।
শূণ্য গভীর রাত কোথায় চড়াই পাখি?
শূণ্য আমার বুক, জল ও নেই চোখে
যতদিন যাচ্ছে হারিয়ে ফেলছি নিজের অস্তিত্বও।
'তাজমহলের' সামনে নিজেকে হারানো যায়-
কিন্তু বৃষ্টি ঝড়া নির্জন সন্ধ্যায় কেন খুঁজি নিজের
স্বত্বাকে!
আমি কি তবে যুগভ্রষ্টা? আমি কি পথ হারিয়েছি?
আসলে যা কিছু আমরা দেখি, সব আলেয়ার মতো
যা দেখা যায়, ভাবা যায় কিন্তু ছুঁতে পারা যায় না।
তুমি যদি স্পর্শ করতে চাও তবে তুমি বদ্ধ পাগল
আর যদি এই আলো ছায়ার সব স্বত্বাকে গ্রহণ
করতে পার তবেই তুমি 'যুগমানব'।

মৃত্যু-জয়

উজ্জ্বল শীল

তুমি কি পারবে সেখান থেকে শুরু করতে
যেখানে অশ্রুগ্রন্থি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।।
তুমি কি পারবে সেই বাস্তবতাকে মেনে নিতে,
যা মেনে নিলে মৃত্যুর মতো হিংস্র
কিছু গ্রাস করে নিতে পারে তোমায়?
তুমি কি পারবে গভীর খাদের ধারে দাঁড়িয়ে
মৃত্যুর জন্য ঝাপ দেওয়ার ঠিক আগে
একবার পিছু ফিরে তাকাতে?
তুমি কি পারবে বুকের প্রবল যন্ত্রণা থেকে
মুক্তি পাবার জন্য কোনও রকম নেশা না করে থাকতে?
তুমি কি পারবে হৃদয়ের প্রচণ্ড আঘাতকে মেনে নিতে
নিজেকে কোনরকম আঘাত না করে?
তুমি কি পারবে সেই ব্যক্তি বা বস্তুর সামনে দাঁড়াতে
যাদের সামনে দাঁড়ালে পূর্ব-পরিচিত অতীতগুলি
তোমায় টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চায়?
তুমি কি পারবে?
যদি পার তবেই তুমি এই সমস্ত মৃত্যুকে জয়
করতে পারবে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত।।

স্পর্শাভিযান

দীপঙ্কর গোস্বামী

যন্ত্রও স্পর্শ কাতর হয়ে উঠেছে
মুখিয়ে থাকে স্পর্শ-ক্ষুধায় ;
ছোঁয়া পেলে নেচে ওঠে
ছোঁয়াছুঁয়ি খেলে বেড়ায়!

কিশোরী কি একথা জেনে গেছে?
যন্ত্রবৎ আচরণ তাই?
দূরভাষ-যন্ত্রে ওপারে নেই সাড়া
সেও আছে স্পর্শ প্রতীক্ষায়।

যন্ত্র ঘিরে যন্ত্রীর বাড়ছে উদ্বেগ

ছুটছে অবিরত স্পর্শ-তৃষায়

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ শ্রাবণ-ভাদ্র মাস কেমন যাবে তার আগাম কিছু আভাস দিচ্ছেন শ্রীগুরু।

মেষ রাশি
এই রাশির জাতক/জাতিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে ; স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। আগুন, জল, বিদ্যুৎ থেকে সাবধান। বিদেশযাত্রা যোগের ক্ষেত্রে শুভ। শুভ সংখ্যা : ৫, অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : সবুজ, অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : বুধ, অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : নিরামিষ, অশুভ খাবার : আমিষ।

বৃষ রাশি
কোনও বাড়তি দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেওয়া অনুচিত। কর্মক্ষেত্রে, বিবাহের ক্ষেত্রে ছক বিচার করে এগোনো দরকার। আটকে থাকা অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে। শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ রঙ : ধূসর, অশুভ রঙ : নীল ; শুভ বার : শুক্র, অশুভ বার : রবি ; শুভ খাবার : বিউলির ডাল, অশুভ খাবার : মুসুর ডাল।

মিথুন রাশি
প্রণয়সূত্রে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা, সন্তানের সাফল্যে আনন্দ, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি লাভ, আর্থিক ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটবে। শুভ সংখ্যা : ৮, অশুভ সংখ্যা : ৫ ; শুভ রঙ : সাদা, অশুভ রঙ : মেরুন ; শুভ বার : বুধ, অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : ঢেঁড়শ, অশুভ খাবার : আলু।

কর্কট রাশি
মতি স্থির হলে কর্মক্ষেত্রে নতুনভাবে সাফল্য আসবে। সন্তান নেবার জন্য ভাল সময়, নতুন কাজের যোগাযোগ বা ঋণ নেওয়া উচিত নয়। শিক্ষায় বাঁধা প্রাপ্তি ঘটতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৪, অশুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ রঙ : কালো, অশুভ রঙ : হলুদ ; শুভ বার : বৃহস্পতি, অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : ছোট মাছ, অশুভ খাবার : মাছের ডিম।

সিংহ রাশি
হঠাৎ নীচ অঙ্গের অস্ত্রোপচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যয় ভার বৃদ্ধি ঘটবে, বিয়ের ক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগের সম্ভাবনা, গৃহ নির্মাণে শুভ সময়। শুভ সংখ্যা : ২, অশুভ সংখ্যা : ৭, শুভ রঙ : খয়েরি, অশুভ রঙ : গোলাপি ; শুভ বার : সোম, অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : পোস্ত, অশুভ খাবার : সরষে।

কন্যা রাশি
বিবাহসূত্রে জন্মস্থানের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা। একাধিক কর্মের মধ্যে দিয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে। তবে চর্ম রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৮, অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ রঙ : নীল, অশুভ রঙ : মেরুন ; শুভ বার : বৃহস্পতি, অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : আটা, অশুভ খাবার : ময়দা।

তুলা রাশি
উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রার যোগ আছে। ব্যবসায় নতুন করে অর্থ লগ্নী করা উচিত নয়। এককভাবে কর্মে উন্নতি হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ২, অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : সাদা, অশুভ রঙ : ধূসর ; শুভ বার : সোম, অশুভ বার : শনি ; শুভ খাবার : ঢেকির শাক, অশুভ খাবার : কচুর শাক।

বৃশ্চিক রাশি
জল ও পথ থেকে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হঠাৎ মামলায় জড়িয়ে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনে শুভ, সন্তানের জন্য শুভ সময়। শুভ সংখ্যা : ১, অশুভ সংখ্যা : ৬ ; শুভ রঙ : গোলাপি, অশুভ রঙ : মেরুন ; শুভ বার : রবি, অশুভ বার : শুক্র ; শুভ খাবার : টক দই, অশুভ খাবার : তেঁতুল।

ধনু রাশি
শেয়ার বাজারে অর্থ লগ্নী করলে শুভ হবে। স্বামী-স্ত্রী একত্রে কাজ করলে শুভ। দূর ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। খাওয়ার ব্যাপারে সাবধান। খাবারের মধ্যে দিয়ে বিষক্রিয়া হতে পারে। শুভ সংখ্যা : ৩, অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ রঙ : আকাশি নীল, অশুভ রঙ : বাদামি ; শুভ বার : বৃহস্পতি, অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : ছানা, অশুভ খাবার : ঘি।

মকর রাশি
পারিবারিক বিবাদ, সন্তানের শিক্ষা নিয়ে দুঃশ্চিন্তার মধ্যে থাকবেন। তবে আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ ঘটবে। শুভ সংখ্যা : ৯, অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ রঙ : লাল, অশুভ রঙ : হলুদ ; শুভ বার : শনি, অশুভ বার : বুধ ; শুভ খাবার : পটল, অশুভ খাবার : এঁচোর।

কুম্ভ রাশি
মাসের প্রথম দিকে মানসিক দুর্ভাবনা থাকলেও শেষের দিকে কিছুটা চাপ মুক্ত হবেন। জাতক জাতিকার কিছুটা অর্থ প্রাপ্তি হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শুভ সংখ্যা : ৩, অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ রঙ : সবুজ, অশুভ রঙ : বেগুনি ; শুভ বার : বৃহস্পতি, অশুভ বার : শুক্র ; শুভ খাবার : মিষ্টি দই, অশুভ খাবার : দুধ।

মীন রাশি
প্রেমপ্রীতি ভালবাসার মধ্যে জড়িয়ে যেতে পারেন। বিয়ে স্থির হয়ে ভেঙে যাওয়ার যোগ আছে। সন্তান স্থান শুভ। স্বাধীন কাজে যুক্ত ব্যক্তি লাভবান হবে। শুভ সংখ্যা : ৫, অশুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ রঙ : সাদা, অশুভ রঙ : কালো ; শুভ বার : শুক্র, অশুভ বার : মঙ্গল ; শুভ খাবার : আম, অশুভ খাবার : লিচু।

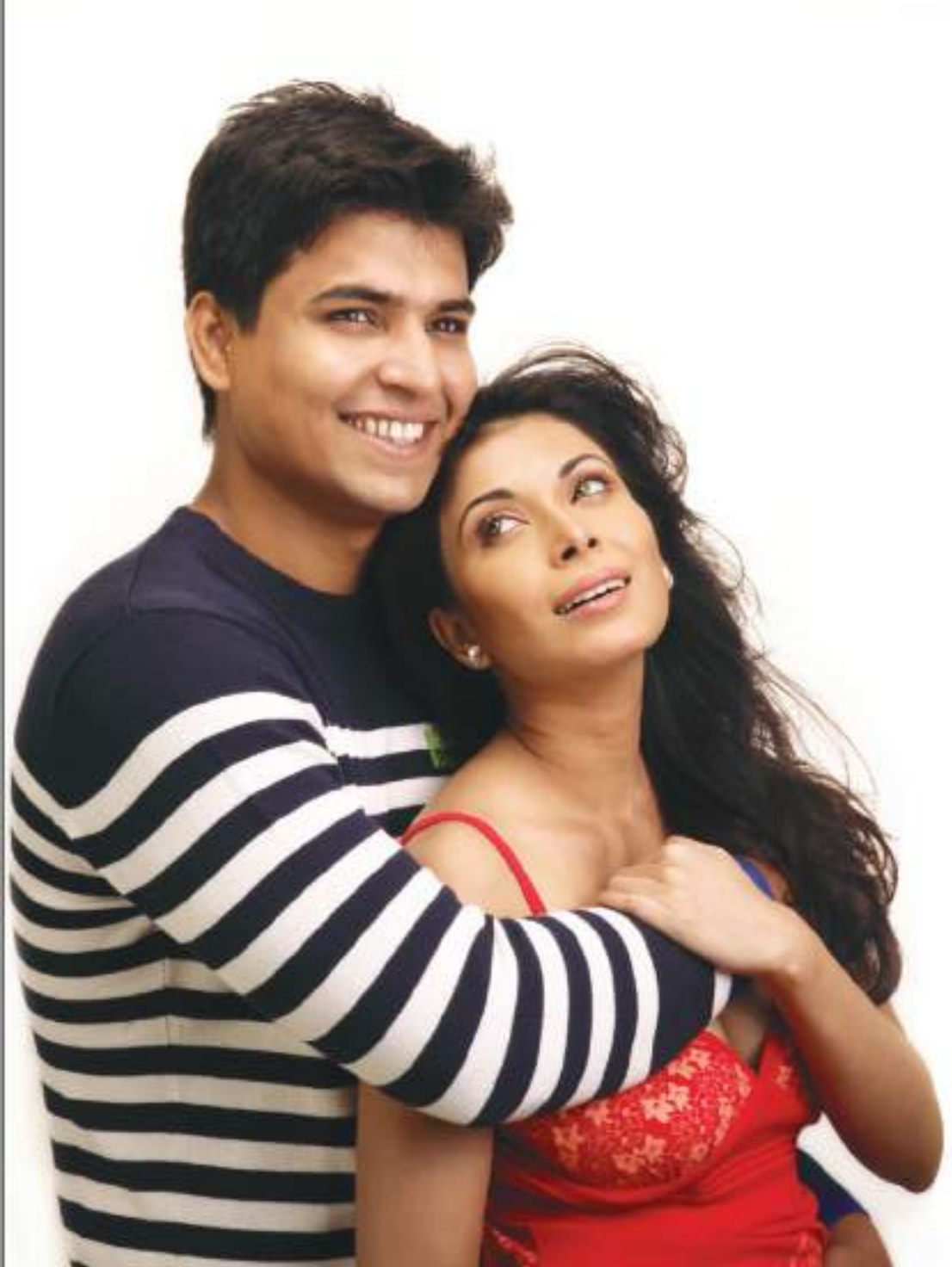

চিন্তা নয়। চাই সুখ।

Suvida 72

আফশোস থেকে আনন্দ

এমারজেন্সি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

REWEL

A Division of
Eskag Pharma

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

RNI NO.: WBBEN/2011/39356

Suvida®
Connecting hearts naturally

গর্ভনিরোধক বড়ি

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।